Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার স্বর্ণা

রোলঃ 216022054

১২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার স্বর্ণা

রোলঃ 216022054

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লিজা আক্তার স্বর্ণা, আইডিঃ 216022054 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১২ জুন, ২০২৪ ইং

লিজা আক্তার স্বর্ণা

আইডিঃ 216022054

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এসকল নবী -রাসূলদেরকে গাইডবুক হিসেবে সহীফা ও কিতাব দিয়েছেন। এসব কিতাব সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল-কোরআন। পূর্ব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরে ঈমান আনা এবং আল-কোরআনকে মেনে চলা মুসলিমদের উপরে আল্লাহ তায়ালা ফরজ করেছেন। আল-কোরআন এসেছে বিশ্ব মানবতাকে হিদায়াতের সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'রমযান মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদের্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।' (সূরা আল-বাকারা-১৮৫)

হিদায়াতের এই কিতাব আল -কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ করা হয়েছে। নিম্নে আল-কোরআন শিক্ষা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেআলোচনা করা হলো আল-কোরআন শিক্ষা করা ফরজ আল-কোরআনের প্রথম বাণী হচ্ছে, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক-১)

এখানে ইক্করা, অর্থ: পড়ো। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসমুলিমকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন তোমরা যিনার জন্য, বোঝার জন্য এবং সঠিকটা মেনে চলার জন্য পড়া-লেখা করো, অধ্যয়ন করো। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফরজ করে দিয়েছেন। আর এটার বাস্তব নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.)।

আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরজ।' (সূনান ইবনে মাজা) জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কোরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়ে ছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলসূ (সা.) বলেছেন, তোমরা কোরআন ও ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন) শিক্ষা করো এবং মানুষদেরকে শিক্ষা দাও কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে।' (সূনা সূ ন আত-তিরমিযি) তাই, আমাদের উপরে কর্তব্য আল-কো রআন ও ইলমে ফারায়েজ (উত্তারাধিকার আইন) শিক্ষা করা এবং এর আলোকে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র পরিচালনা করা। আল-কোরআন শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আল-কোরআন অধ্যয়ন করা, কোরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করা পৃথিবীর সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ এ কো রআনের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, হিদায়াতের সঠিক পথ। প্রত্যেক কাজ শুরু করার সময় রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নিয়ে) শুরু করার কথা বলে ছেন। তবে যেকোনো কাজ শুরু করার আগে 'আউযুবিযু ল্লাহি মিনাশ শাইতারিজ রাজীম' অর্থাৎ শয়তা নের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেননি। তবে একটি কাজ করার আগে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, সেটা হলো আল-কোরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময়। এ সম্পর্কে আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সুতরাং যখন তুমি কোরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।' (সূরা আন-নাহল-৯৮)

হাদিস হতে কিছু কথাঃ-

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

'যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয় সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' বুখারী

মুসলিম শরীফে আছে :

اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدُكُمْ اِلٰى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ اٰيَتَيْنِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌلَّهُ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

"তোমাদের মধ্যে কেহ মসজিদে গিয়ে কুরআনের দুইটি আয়াত কেন শিক্ষা লাভ করে লয় না? কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করা দুইটি উট অপেক্ষা অধিক ভাল। এইরূপে তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা এবং চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা

অধিক ভাল। এমনিভাবে যত সংখ্যক আয়াত হবে, তত সংখ্যক উট হতে অধিক ভাল।"

আল-কোরআনের এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, শয়তান সকল কাজেই বান্দা কে কুমন্ত্রণা দেয়। তবে কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে। কোরআনের কথা যেন মানুষ বুঝতে না পারে, সে জন্য শয়তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকে। মুসলমানরা কোরআন থেকে দূরে সরে থাকলে শয়তান বেশি খুশি হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআন অধ্যয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলেছেন।

এজন্য আমাদের উচিত আল- কোরআন জানা ও বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করা। আল-কোরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবাতার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব। এই কোরআনই বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় এ কোরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরপুস্কার। আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' (সূরা বনি ইসরাইল- ৯-১০)

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।' (সূরাআল-মায়েদা- ১৫-১৬)

আল-কোরআন ছাড়া অন্য কারো কাছে হিদায়াত অন্বেষণ করা যাবে না। কেউ এটা করলে আল্লাহ নিজে তাকে গুমরাহ করে দিবেন। এ সম্পর্কে আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্য ক্তি কোরআন ছাড়া অন্য করো কাছে হিদায়াত চাইবে, আল্লাহ তা কে পথভ্রষ্ট করে দিবেন।' (সূনান আত-তিরমিযি) অতএব, আমাদের জীবন চলার পাথ ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য হিদায়াতের একমাত্র কিতাব আল-কোরআন শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে।

কুরআন শরীফের আয়াত উট অপেক্ষা অধিক ভাল, ইহা বুঝতে বেশী কিছু চিন্তার দরকার হয় না। কারণ, উট তো একমাত্র দুনিয়াতেই কাজে আসে, আর কুরআনের আয়াত দুনিয়া ও আখেরাত দু-জাহানে কাজে আসে। এখানে উটকে উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, আরব দেশের লোকেরা উটকেই বড় সম্পত্তি মনে করে, নতুবা একটি আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বেরও কোন মূল্য হয় না।

এই হাদীস দ্বারা এই উপদেশ লাভ করা যায় যে, সমস্ত কুরআন শরীফ না পড়তে পারলেও যতটুকু পড়–ক না কেন ততটুকুতেই বড় ফযীলত ও অতি বড় নেয়ামত। হাদীসে আছে-

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ. بخارى

‘যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে অনায়াসে কুরআন শরীফ পড়তে পারে সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে, যাঁরা বড়ই পবিত্র, বড়ই সম্মানী এবং যারা লোকের আমলনামা লিখেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে, কিন্তু মুখে বাধবাধ ঠেকে এবং বড়ই কঠিন বোধ করে, সে-ও দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।’ দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ এই যে, শুধু পাঠ করার জন্য এক সওয়াব পাবে, আর পড়ার সময় কষ্টের কারণে যে বিরক্ত হয়ে পড়া ক্ষান্ত না করে পড়তে থাকে, তজ্জন্য আর একটি সওয়াব পাবে। -বুখারী শরীফ

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভালমত পাঠ করতে না পারা সত্তে¡ও বিরক্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে দেয় না, তার জন্য এই হাদীস কত বড় খোশখবরী (সুসংবাদ) দেওয়া হয়েছে যে, তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। অন্য হাদীসে আছে-

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِه شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. ترمذي

‘যাহার সিনার মধ্যে (অন্তরে) একটুও কুরআন নাই, সে যেন একখানা উজাড় ঘর।’ -তিরমিযী কোনো মুসলমানের অন্তরই কুরআন শূণ্য থাকা চাই না। হাদীসে আছে-

مَنْ قَرَأَ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ . ترمذي

‘যে ব্যক্তি (আল্লাহর কিতাব) কুরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর প্রত্যেক নেকি দশ নেকির সমান (এই হিসাবে প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকি করে পাওয়া যায়)। আমি এ কথা বলি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’

এক অক্ষর; বরং ‘আলিফ’ এক অক্ষর, ‘লাম’ এক অক্ষর এবং ‘মীম’ এক অক্ষর। -তিরমিযী

এর দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ ‘আলহামদু’ পড়ে, তবে এর পাঁচটি অক্ষরের পঞ্চাশ নেকি পাবে। আল্লাহু আকবার! কত বড় ফযীলত। সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে যে এত বড় ফযীলত হাসিল না করবে, তার উপর বড়ই আক্ষেপ।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَاظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا.

‘যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়েছে এবং উহার হুকুমের উপর আমল করেছে, তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ (মুকুট) পরান হবে, যার আলোক সূর্যের আলোক হতে অধিকতর উজ্জল হবে- যে আলোক দুনিয়াতে যে সূর্য যখন তোমাদের মধ্যে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে হয় অর্থাৎ, সূর্য যখন কাছে আসে, তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে কত আলো হয়, সেই তাজের আলো ইহা অপেক্ষাও অধিক হবে। যখন মাতা-পিতার এত বড় মর্তবা হবে, তখন যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন শরীফ পড়বে ও তদনুযায়ী আমল করবে, তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? অর্থাৎ, তার মর্তবা অসীম ও অতুলনীয়।’

কুরআন এর পরিচয়: কুরআনের পরিচয়:-

পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন, শাশ্বত, মহাগ্রন্থ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। এটি মহাসত্যের সন্ধানদাতা, সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ইলাহী কিতাব। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জ্ঞান ও হেদায়াত লাভের উৎসমূল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا، وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيْثَةً تَفْتَحُ فِيْهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا- ‘তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি বিবেকের খোরাক, প্রজ্ঞার আলোকমালা, জ্ঞানের প্রস্রবন, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধুনিক। আর আল্লাহ তাওরাতে

বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার উপর সর্বাধুনিক কিতাব নাযিল করেছি। যা অন্ধের দৃষ্টিকে, বধিরের শ্রবণশক্তিকে এবং অনুভূতিশূন্য বদ্ধ হৃদয়ের বোধশক্তিকে উন্মোচিত করবে'।[1]

কুরআন (القرآن) শব্দের অর্থ পঠিত, তেলাওয়াতকৃত। যা সবকিছুকে শামিল করে। আর কুরআনকে 'কুরআন' এজন্যই বলা হয় যে, তাতে শুরু-শেষ, আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম, প্রতিশ্রুতি-ধমক, শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, উপদেশ, দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। আর সেইসাথে রয়েছে আয়াতগুলির একে অপরের সাথে অনন্য সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য।

কুরআন তিলাওয়াতকারী : যার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া কাম্য

সচেতন ব্যক্তি মাত্রই যেকোনো কল্যাণ লাভে ঈপ্সিত থাকে। একজন সচেতন মুমিনের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরের ভালো দেখে সে তার ধ্বংস কামনা করে না; বরং সে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নেয়। আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللّيْلِ، وَآنَاءَ النّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَل.ُ

কারো সাথেই হিংসা নয়, তবে দু'জন এর ব্যতিক্রম। প্রথমজন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬, ৪৭৩৮

কুরআন মাজীদ এত মহিয়ান নিআমত যে, আল্লাহ যাকে এ নিআমত দান করেন আর এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ দিবারাত্রি তা তিলাওয়াত করে- এমন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়। আর এমন ব্যক্তিকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করছেন।

প্রতি মাসে চাই কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করা

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় নির্ধারিত থাকবে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফাক্কুর-তাদাব্বুরের (কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণের) জন্য। দিনের সূচনা তিলাওয়াতের মাধ্যমে হলে তো আরো ভালো কথা। এটা বরকতের ব্যাপারও বটে। তবে যাইহোক প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ তিলাওয়াত রুটিনে থাকা চাই।

সবচে সুন্দর হয় যদি মাসে অন্তত একটি খতম করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসে একবার খতম করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরচে বেশি পারব। নবীজী বললেন, তাহলে বিশ দিনে খতম করো। তিনি বললেন, আমি আরো বেশি পড়তে পারব। নবীজী বললেন, তাহলে সাত দিনে খতম করো। এরচে বেশি পড়তে যেয়ো না। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৯; সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৬৭, ৫০৫৪)

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। তবে কম হিম্মতওয়ালাদের জন্য নবীজী সহজ করে বলেছেন মাসে একবার খতম করতে। কাজেই আমরা যদি প্রতিদিন অন্তত এক পারা তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলি তাহলে সহজেই মাসে এক খতম হয়ে যায়। আর এই এক পারা একসাথে পড়াও জরুরি না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে-পরে অল্প অল্প করে তিলাওয়াত করলেও তো এক পারা তিলাওয়াত হয়ে যায়।

প্রতিদিন কত সময় তো কত কাজে কেটে যায়! অপ্রয়োজনীয় কত ব্যস্ততায়ও তো চলে যায় কত সময়! কিন্তু তিলাওয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য বের হয় না কিছু সময়। আসলে প্রয়োজন শুধু একটু সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক নসীব করুন- আমীন।

কুরআনের বিশেষত্ব:প্রথম মানব ও নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহ দুনিয়ায় অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়- মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এটি আল্লাহর পক্ষ অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ, কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ‘এই সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদের যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।’ সুরা বাকারা : ২-৪

পবিত্র কোরআন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সংবিধান। কিয়ামত পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান রয়েছে এখানে। কোরআনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনকারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদার ঘোষণা। এক হাদিসে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।’ সহিহ্ বোখারি : ৪৭৩৯

অন্য হাদিসে এসেছে, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কিছু লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কারা? তিনি বলেন, কোরআন তেলাওয়াতকারীরা আল্লাহর পরিজন এবং তার বিশেষ বান্দা।’ ইবনে মাজাহ : ২১৫

কোরআন পাঠ করলে এর প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করল, সে দশটি সওয়াবের অধিকারী হলো। তিনি আরও বলেন, আমি বলছি না ‘আলিফ-লাম-মিম’ একটি হরফ। বরং আলিফ একটি, লাম একটি এবং মিম একটি হরফ।’ সুনানে তিরমিজি : ২৯১০

কোরআন তেলাওয়াতকারীর পাশাপাশি তার মাতা-পিতা ও পরিবারের লোকজনও এর উপকারিতা ও সুফল ভোগ করে। হজরত মুয়াজ জুহানি (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাহলে তার মা-বাবাকে হাশরের মাঠে একটি নুরের মুকুট পরানো হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরে প্রবেশ করত, তাহলে ওই সূর্যের আলোর চেয়ে মুকুটের আলো বেশি উজ্জল হবে।

এখন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি কোরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তার মর্যাদা ও অবস্থান কত উত্তম হবে?’ সুনানে আবু দাউদ : ১৪৫৩

জীবনে চলার পথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ছোট-বড় অনেক অপরাধের সঙ্গে জড়ায় মানুষ। অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি তার বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটায়। বিষয়টি হজরত নবী কারিম (সা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, ‘জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়।

জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো কলব বা হৃদয়।’ সহিহ্ বোখারি : ৫০

অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানুষ যখন অপরাধ করে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়, তখন তার কলব কলুষিত হতে থাকে। গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ধারাবাহিকতায় কলব এক সময় কুৎসিত রূপ ধারণ করে। এমন কলবের অধিকারীকে আল্লাহ চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো;

বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।' সুরা আরাফ : ১৭৯

গোনাহের কারণে কলুষিত হৃদয়কে আলোকিত করতে প্রয়োজন 'জিকরুল্লাহ' তথা আল্লাহর স্মরণ। আর আল্লাহর স্মরণের অন্যতম মাধ্যম-পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত। কোরআনের রয়েছে অভাবনীয় শক্তি ও প্রভাব। এর পঠন ও শ্রবণে রয়েছে এক অন্যরকম ভালো লাগা, স্বর্গীয় সুখ ও আত্মিক প্রশান্তি। কঠোর হৃদয় প্রাণও কোরআনের সান্নিধ্যে এসে মুহূর্তে বিগলিত ও নরম হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, শুধু কোরআন ছাড়া প্রত্যেকটির মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। কোরআনের সংরক্ষণ ও ত্রুটিমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। এটি কোরআনের অন্যতম বিশেষত্ব। আল্লাহ বলেন, 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।' সুরা হিজর : ৯

কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা ও অসম্মান প্রদর্শনকারীর ব্যাপারেও কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং যে আমার স্মরণ (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সুরা ত্বহা : ১২৪

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে দুনিয়ার জীবনে সংকটাপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামতের দিন মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন ধরন হতে পারে। যেমন কোরআন তেলাওয়াত না করা, কোরআন শেখার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরগুলোর অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা, কোরআন শেখার পর তা ভুলে যাওয়া। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলি বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ ও অসম্মান প্রদর্শন চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফেরানো। মোট কথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরোয়া হওয়া বড় গোনাহ। কিয়ামতের দিন এই গোনাহের বোঝা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

যে তিলাওয়াত করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত:

নেককার-বদকার সবার জন্যই আল্লাহর কালাম। যে নিয়মিত তিলাওয়াত করে, যে করে না সবার জন্যই কুরআন। আমি চেষ্টা করব তিলাওয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে, বরং আমার চেষ্টা থাকবে 'ছাহিবে কুরআন' হওয়ার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শ্রেণিকে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (এবং সে অনুযায়ী আমল করে) সে উতরুজ্জা ফলের মতো, যার স্বাদও ভালো ঘ্রাণও সুন্দর। আর যে কুরআন পড়ে না সে খেজুরের মতো। যার স্বাদ ভালো, তবে কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে সে রায়হানা সুগন্ধির মতো, যার ঘ্রাণ তো মোহনীয়, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে হানযালা ফলের মতো, যার স্বাদও তেতো, আবার কোনো সুবাসও নেই। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২০

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

تَعَلّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ، فَإِنّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوّ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِئَ عَلَى مِسْكٍ.

তোমরা কুরআন শেখ। অতঃপর তা পড় এবং পড়াও। কেননা যে ব্যক্তি কুরআন শিখল এরপর তা পড়ল এবং রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাযে তা তিলাওয়াত করল, সে ব্যক্তি এমন পাত্রের মতো, যা মেশক আম্বর দিয়ে পূর্ণ, যা সর্বত্র সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখে শুয়ে থাকল এ ব্যক্তি এমন পাত্রের ন্যায়, যা মেশক ভরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তা থেকে আর সুগন্ধি বিকরিত হয় না।) -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৮৭৬

এ হল কুরআন শিখে তিলাওয়াত করা আর না করার পার্থক্য। তিলাওয়াতে কুরআন কারীম এমন এক আমল, যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সম্পর্কের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে কালামুল্লাহর সুবাস বিকরিত হয়। ঘ্রাণে ঘ্রাণে তা শুভ্র-সতেজ করে তোলে মুমিনের দেহমন। আলোড়িত করে তার মন-মনন। কাজেই কুরআন শিখে তা না পড়া অনেক বড় অপরাধ। আর একজন ঈমানদার বান্দা, যে আল্লাহ ও রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি বিশ^াস রাখে, এমন ব্যক্তি আল্লাহর কালাম সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না।

আফসোসের বিষয় হল, যেই মুসলমানের ঘর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হওয়ার কথা ছিল সেখানে অনেক ঘর এমন পাওয়া যায় যেখানে পুরো বছর কুরআন শরীফ কেবলই আলমারির শোভা হয়ে থাকে। রমযান এলে আবার মনে পড়ে কালামুল্লাহর কথা। এটা অত্যন্ত আপত্তির বিষয়। মুমিনের জীবন তো আবর্তিত হবে কুরআনকে ঘিরে। কুরআন থেকে সে আলো গ্রহণ করবে। সে আলোতে পথ দেখবে। তবেই তো গন্তব্যের দেখা মিলবে! তাই আসুন, কুরআনের আরো ঘনিষ্ঠ হই। পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অধীনস্তসহ সবাইকে কুরআনের কাছে থেকে কাছে আনার ফিকির করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারী শ্রেষ্ঠ :

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রয়েছেন। সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের চাইতে কুরআন শিক্ষাগ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীগণ সর্বশেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পরিগণিত। ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه- 'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[2] অন্য বর্ণনায় এসেছে,إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه- 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিখায়'।[3] অতএব কুরআন নিয়মিত

তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করে তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।

উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। আর সবের্বাচ্চ কুরআন হিফযকারীকে রাসূল (ছাঃ) আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন। যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِّلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْد- 'নবী করীম (ছাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্রিত করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআনে অধিক বিজ্ঞ কে? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হ'ল, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে নামানোর নির্দেশ দিলেন'।[4] অত্র ঘটনায় কুরআনে পারদর্শিতা অর্জনের সম্মান বর্ণিত হয়েছে। যা জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব :

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। কুরআন তেলাওয়াতের সময় মাখরাজ সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করলে বা তাজবীদের নিয়ম সমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ না করলে অনেক সময় আয়াতের মর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে পাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ধীরে-সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا- 'আর কুরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, সৌন্দর্যমন্ডিত পন্থায়' (মুযযাম্মিল ৭৩/৪)। তিনি আরও বলেন, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا- 'আর আমরা তোমার উপর পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে কুরআন নাযিল করেছি' (ফুরক্বান ২৫/৩২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا- 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কেননা সুমধুর কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়'।[6]

কুরআনের পরিপূর্ণ হেফাজত জরুরী :

পবিত্র কুরআনের যথার্থ হেফাযত করতে হবে। মুখস্থকৃত সূরা বা আয়াত বারবার তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন বিস্মৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا- ‘তোমরা কুরআনের যথাযথ হেফাযত ও সংরক্ষণ কর। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও দ্রুত বেগে এ কুরআন চলে যায়’।[8] অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি যত্নবান না হ’লে কুরআন স্মৃতি থেকে দ্রুত হারিয়ে যাবে।

রামাদ্বানে অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত :

রামাদ্বান মাসে হেরাগুহায় কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর (রামাদ্বানে) জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একবার কুরআন পাঠের পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে দু’বার কুরআন পাঠ করেন।[9] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘জিব্রীল (আঃ) রামাদ্বান শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতি রাতেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন’।[10] অতএব রামাদ্বান মাসে অন্তত একবার পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শেষ করা উত্তম।

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত :

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানূন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কুরআন আল্লাহর কিতাব। এর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ইবাদত। এটি মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিবিধ কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আরও কিছু

অনুসন্ধান করার পথ দেখায়, যাতে সে এর মাধ্যমে উভয় জাহানে সম্মানিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআন পঠিত কোন সাধারণ বইয়ের মতো নয়। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। যা তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। তাই নিম্নে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় ছাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। যেমনটি তিনি অন্যান্য মুমিনের চাইতে কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ- ‘যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল উৎরুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) ন্যায়। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হ’ল খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে, সে হ’ল রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়। যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে হ’ল মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত’।[11]

কুরআন তেলাওয়াতকারীর দুনিয়াবী মর্যাদা :

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে‘ বিন আব্দুল হারিছ (রাঃ) উসফান নামক স্থানে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। ওমর (রাঃ) তাকে কর্মকর্তা হিসাবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফে‘কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও ত্বায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে। ওমর

(রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ইবনু আবযা? তিনি বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের একজন। ওমর (রাঃ) বললেন, فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى? 'তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?' নাফে' বললেন, إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ، 'তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েয শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক'। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী (ছাঃ) যথার্থই বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ- 'এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কুরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন'।[12]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, আল্লাহ প্রেরিত কুরআনের উপর ঈমান ও আমলের বদৌলতে মানুষ উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন বিমুখ হ'লে মানুষ উভয় জগতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

আসমান ও যমীনে উচ্চসম্মান অর্জন :

কুরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের উচ্চসম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কুরআন তেলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও যমীনে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ- 'কুরআন তেলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য যমীনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভান্ডার স্বরূপ'।[15]

অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের দিকে ও আল্লাহর দিকে পরিচালিত করবে, মহান আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেকারণ তেলাওয়াতকারীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবদিকে বিস্তৃত হয়। সুতরাং কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছে মহা সম্মানিত হয়।

গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি :

নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতে ঈমান মযবূত হয়। অন্তরের মরীচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,... وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِين- '...আর যে ব্যক্তি রাতে একশ'টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে'।[16]

তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয় :

পৃথিবীর বুকে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপসমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে যাবতীয় গোনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হ'ল কুরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ إِلاَّ قِيْلَ لَهُمْ : قُوْمُوْا مَغْفُوراً لَّكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات- 'যখন কোন জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দন্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে'।[17]

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন :

প্রত্যেক কর্মী তার কর্মের বিনিময় পেয়ে থাকে। প্রত্যেক অধস্তন দায়িত্বশীল তার দায়িত্বের জন্য ঊর্ধ্বতনের কাছে দো'আ, পারিতোষিক পেয়ে থাকেন। ঠিক অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের জন্য তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه- 'আর যখন

কোন জনসমষ্টি আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেবে বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না'।[20]

কুরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না :

কুরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُّعَذِّبَ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ- 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। আর বাড়ীতে সংরক্ষিত কুরআন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ঐ অন্তরকে কখনোই শাস্তি দিবেন না, যা কুরআনের সংরক্ষক'।[21] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُبْشِرِ- 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে যেন আনন্দিত হয়'।[22]

সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ :

দক্ষ তেলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তেলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ- 'কুরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তেলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে'।[24]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, যারা দক্ষতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম তারা আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবেন।

ছিয়াম ও কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন :

ছিয়াম ও কুরআন মানুষকে সর্বদা নেকীর কাজে মশগূল রাখে। তাই ছিয়াম ও কুরআন বিশেষভাবে আল্লাহর নিকট ছায়েম ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা‘আত করবে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ - ‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। অন্যদিকে কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা‘আত কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের শাফা‘আত কবুল করা হবে’।[27]

কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা :

পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা ও সেটা সংরক্ষিত রাখা চূড়ান্ত ধৈর্য ও সর্বোচ্চ স্মৃতিশক্তির কাজ। এই অসাধ্য সাধনকারীদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهْوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهْوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان - ‘কুরআনের হাফেয ও তেলাওয়াতকারীগণ সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বদা তেলাওয়াত করে কুরআনের হিফযকে সংরক্ষিত রাখে, সে দ্বিগুণ নেকী হাছিল করবে’।[29]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর সমূহ বিদীর্ণ হয়ে সবাই পুনরুত্থিত হবে, তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট বিপর্যস্ত এক ব্যক্তির অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا

لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولاَنِ : يَا رَبُّ، أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُمَا : بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن، ‘তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? আমিই তোমাকে রজনীতে বিনিদ্র রেখেছি এবং দিবসে পরিশ্রান্ত করেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে। আর তুমিও আজ পরকালের জন্য সম্পাদিত তোমার সকল ব্যবসার পূর্ণ মুনাফা অর্জন করবে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব প্রদান করা হবে এবং বাম হাতে এর স্থায়িত্ব দেওয়া হবে। তার মাথায় সম্মানের রাজমুকুট পরানো হবে। সেই সাথে হাফেযের পিতা-মাতাকে দুই খন্ড পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ায় ইতিপূর্বে আর কারো জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, এ পোষাক আমাদেরকে পরিধান করানো হ’ল কেন? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ’।[30]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান :

কুরআন মাজীদের প্রকৃত বাহকের মর্যাদা সর্বাধিক। তাই হাফেযে কুরআন ও আলেমের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা আবশ্যক। যেমন আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْه، ‘বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম ও কুরআনের যথাযথ বাহক, যিনি তাতে সীমালঙ্ঘনকারী ও অবহেলাকারী নন, এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা মূলতঃ আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত’।[31]

কুরআনের আলোকে মুমিনের পরিচয় :

আরবি ‘মুমিনুন’ শব্দটি ‘আমনুন’ শব্দমূল হতে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- যে স্বীকার করে, স্বীকৃতি দেয়, বিশ্বাস করে। ব্যবহারিক পরিভাষায় মুমিন তাকেই বলা হয়, যে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী। নবী ও রাসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যে সকল হেদায়েত নিয়ে আগমন করেছেন, তাকে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সত্য বলে মেনে নেয়া, মুখে তার স্বীকৃতি প্রদান করা, এবং তদানুসারে কর্ম

সম্পাদনকে ঈমান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

আর যে ব্যক্তি ঈমানের ঘোষণা প্রদান করে, তাকেই মুমিন বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুমিন তাকেই বলা হয় যে, এক আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ, ফিরিস্তাগণ, আল্লাহর কিতাব সমূহ, আখিরাত এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

মহান রাব্বুল আলামীন কোরআনুল কারীমে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। (ক) মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মিমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (সূরা হুযরাত : আয়াত ১০)।

(খ) মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়ক। ইরশাদ হয়েছে : আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ : আয়াত ৭১)।

(গ) মুমিনগণ যেভাবে প্রশান্তি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে : যারা ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই অন্তর সমূহ প্রশান্ত হয়। (সূরা রাআদ: আয়াত ২৮)। (ঘ) মুমিনগণ যাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে। ইরশাদ হয়েছে : মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, আর যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, তবে তাদের পক্ষ থেকে যদি তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, আর আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৮)।

(ঙ) সত্যিকার মুমিন হওয়ার উপায়। ইরশাদ হয়েছে : আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল : আয়াত ৭৪)। (চ) প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইরশাদ হয়েছে : প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি, আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, এরাই

সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুযরাত : আয়াত ১৫)। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর সমূহ প্রকম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, এবং যারা কেবলমাত্র তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল : আয়াত-২)। অন্য এক আয়াতে আরও ঘোষণা করা হয়েছে : যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা হতে দান-খয়রাত করে। (সূরা আনফাল : আয়াত-৩)। আল্লাহপাক আরও ইরশাদ করেছেন : তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা সমূহ, এবং মাগফেরাত ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল : আয়াত ৪)।

(ছ) সফলকাম মুমিনদের কথাও আলকুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : ওই সকল মুমিনগণই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা বার্তায় নির্লিপ্ত ও বিতৃষ্ণ, যারা যাকাত দানে তৎপর, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না, তারপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে, এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে, এবং যারা তাদের নামাজ সমূহের হেফাজত করে, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা ছায়াময় সুশীতল উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (সূরা মুমিনুন : আয়াত ১-১১)। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহŸান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শ্রবণ করেছি, আদেশ মান্য করেছি। তারাই সফলকাম। (সূরা নূর : আয়াত ৫১)। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনাই করছি, তিনি যেন আমাদেরকে খালেস মুমিন হওয়ার তাওফিক এনায়েত করেন আমীন!

কুরআনে আলোচিত মুমিনদের ৭ টি বৈশিষ্ট্য :

ঈমান যাদের আছে, তাদের মুমিন বলে। যারা ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাদের ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে ঈমান রাখা অপরিহার্য। মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, ‘মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অতঃপর তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি।

আর তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ।' (সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১৫)

সুরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের এমনই কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছ মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত।

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা জাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সবার থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমা লঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হলো সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মিরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। ' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১-১১)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

প্রথম গুণ : যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজে 'খুশু' অবলম্বন করে। নামাজ ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'নামাজে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।' (সুনানে নাসায়ী, হাদিস : ৩৯৪০)

দ্বিতীয় গুণ : যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হলো, সে অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেঁচে থাকে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা।' (তিরমিজি, হাদিস ২৩১৮)

অহেতুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হলো, সব ধরনের গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। তেমনি এমন কথা, কাজ, লেখা ও চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা, যাতে না দ্বিনি কোনো ফায়দা আছে, না দুনিয়াবি কোনো ফায়দা আছে।

তৃতীয় গুণ : যারা জাকাত সম্পাদনকারী। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন জাকাত আদায় করে। জাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। হাদিসের ভাষায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই ঈমানের অপরিহার্য দাবি, জাকাত ফরজ হলে তা আদায় করা। জাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তা মজা করে ভোগ করো।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)

চতুর্থ গুণ : যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না। নিজের স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তার চাহিদা পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩০-৩১)

পঞ্চম গুণ : এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এই আয়াতে মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে : এক. মুমিন আমানতের হেফাজত করে। আমানতের হেফাজত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আমানত হেফাজতের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮)

ষষ্ঠ গুণ : অঙ্গীকার পূর্ণ করা। অঙ্গীকার বলতে প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বোঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ (বাধ্যতামূলক) এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয়

ধরনের অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। ওয়াদা পূর্ণ করা ইসলামী আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

সপ্তম গুণ : যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। 'নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ করে' কথাটা ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন—যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, কখনো পড়বে কখনো পড়বে না—এমন নয়। সময়মতো জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া। সব শর্ত, আদব ও নিয়মাবলি রক্ষা করে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করা। (তাফসিরে কাবির ২৩/২৬৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন

কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বর্ণনা :

মহান আল্লাহ প্রতিটি কর্মের হিসাব নেওয়ার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে রেখেছেন; যাকে আল কোরআনে কেয়ামতের দিবস বা হিসাবের দিন নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেদিন যাদের আমলনামার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন তাদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী শান্তির নীড় বিলাসবহুল জান্নাত। আর যাদের আমলনামার প্রতি আল্লাহ

অসন্তুষ্ট হবেন তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ঠিকানা জাহান্নাম। আল্লাহ জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বিবরণ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

কোরআনে বর্ণিত জাহান্নামের সংখ্যা সাত-

১. সায়ির : 'এভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশপাশের মানুষকে সতর্ক করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন কেয়ামতের দিবস সম্পর্কে, যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল মানুষ যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে সায়ির তথা প্রজ্বলিত আগুনে। ' (সুরা শুরা, আয়াত ৭)

২. লাজা : 'কখনই নয়, নিশ্চয় এটা লাজা তথা লেলিহান অগ্নি; যা চামড়া খসিয়ে দেবে। তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে ডাকবে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সম্পদ জমা করেছিল এরপর সংরক্ষিত করে রেখেছিল।
' (সুরা মাআরিজ, আয়াত **১**৫-**১**৮)

৩. সাকার : 'অচিরেই আমি তাকে সাকারে নিক্ষেপ করব। আপনি কি জানেন সাকার কী? এটা কাউকে জীবিত অবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না। শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে। সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে **১**৯ জন (ফেরেশতা)।

সুরা মুদ্দাস্সির, আয়াত ২৬-৩০)

৪. জাহিম : 'আর দর্শকদের জন্য জাহিম (জাহান্নাম) প্রকাশ করা হবে। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, নিশ্চয় জাহিম হবে তার ঠিকানা। ' (সুরা নাজিয়াত, আয়াত ৩৬-৩৯)

৫. হাবিয়া : 'আর যার (নেকির) পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া তথা গভীর গর্ত। আর আপনি কি জানেন হাবিয়া তথা গভীর গর্ত কী? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। ' (সুরা কারিয়াহ, আয়াত ৮-**১১**)

৬. হুতামা : 'কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় তথা পিষ্টকারীর মধ্যে।

আপনি কি জানেন হুতামা তথা পিষ্টকারী কী? তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন; যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। নিশ্চয় এটা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, লম্বা লম্বা স্তম্ভসমূহে। ' (সুরা হুমাজাহ, আয়াত ৪-৯)

৭. জাহান্নাম : 'নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় রয়েছে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোনো শীতল এবং পানীয়ধ আস্বাদন করবে না; তবে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। ' (সুরা নাবা, আয়াত ২১-২৬)

জাহান্নামিদের পোশাক : জাহান্নামিদের পোশাক হবে আলকাতরার ও আগুনের। এ ব্যাপারে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'সেদিন আপনি অপরাধীদের দেখবেন শিকলে কষে বাঁধা আবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার ও আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে। ' (সুরা ইররাহিম, আয়াত ৪৯-৫০) 'অতএব, যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তাদের উদরস্থ সবকিছু এবং চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বেরোতে চাইবে, তখনই তাদের তার ভিতর ফিরিয়ে দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর। ' (সুরা হজ, আয়াত ১৯-২২)

জাহান্নামিদের খাদ্য : আল্লাহ জাহান্নামিদের ক্ষুধার্ত রেখেই শাস্তি দিতে পারতেন, পক্ষান্তরে তাদের শাস্তির যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি করার জন্য জাক্কুম, জরি, ফুটন্ত পানি, পুঁজ ইত্যাদি নিকৃষ্ট আহারের ব্যবস্থা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'এই আতিথেয়তা উত্তম না জাক্কুম বৃক্ষ? আমি একে জালিমদের জন্য বানিয়েছি বিপৎস্বরূপ। বস্তুত এটি এমন গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়। এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মতো। সুতরাং জালিমরা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এর ওপর তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে। ' (সুরা সাফফাত, আয়াত ৬২-৬৮)

কুরআনের আলোকে জান্নাতের বর্ণনা :

জান্নাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ উদ্যান, বাগান, আরামদায়ক স্থান ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, পার্থিব জীবনাবসানের পর মোমিনের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য মহান আল্লাহ যে সুখময় আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন তাকে জান্নাত বলা হয়। বিচার দিবসে দয়াময় আল্লাহ যাদের আমলনামার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তাদের দান করবেন ফুলে ফলে সুশোভিত, সুরম্য অট্টালিকাসংবলিত মনোমুগ্ধকর সুবিশাল ও চিরস্থায়ী শান্তির নীড় বিলাসবহুল জান্নাত; যার তলদেশে প্রবাহিত বিভিন্ন ধরনের নদী-নালা ও ঝরনাধারা। সেখানে আনন্দ উপভোগের সব রকমের জিনিসই থাকবে বিদ্যমান। পূরণ করা হবে অন্তরের সব অভিলাষ। আর সেখানের বাসিন্দারা হবেন সার্বিক অকল্যাণ থেকে সর্বদা মুক্ত। মহান আল্লাহ জান্নাতের নিয়ামতরাজির বিবরণ কোরআনুল আজিমের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন। কোরআনে জান্নাতের সংখ্যা আট-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস : যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ‘জান্নাতুল ফিরদাউস’। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে থেকে তারা অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। (সুরা কাহাফ, আয়াত ১০৭-১০৮)

২. দারুল মাকাম : যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের ‘দারুল মাকাম’ তথা স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে কোনো কষ্ট-ক্লেশ আমাদের স্পর্শ করবে না। (সুরা ফাতির, আয়াত ৩৫)

৩. দারুল কারার : হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে ‘দারুল কারার’ তথা চিরস্থায়ী আবাস। (সুরা মোমিন, আয়াত ৩৯)

৪. দারুস সালাম : আর আল্লাহ আহ্বান করেন ‘দারুস সালাম’ তথা শান্তির আলয়ের দিকে এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সুরা ইউনুস, আয়াত ২৫)

৫. জান্নাতুল মাওয়া : তার কাছে ‘জান্নাতুল মাওয়া’ অবস্থিত। যখন কুল গাছটি যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল। তার (রসুলের) দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি। (সুরা নাজম, আয়াত ১৫-১৭)

৬. দারুন নাইম : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন। আর আমাকে 'জান্নাতুন নাইম' তথা নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সুরা শুআরা, আয়াত ৮৩-৮৫)

৭. দারুল খুলদ : যখন তাদের বাঁধা অবস্থায় (জাহান্নামের) কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে। (তখন তাদের বলা হবে) আজ তোমরা কেবল একবারের জন্য মৃত্যু কামনা কোরো না, বরং বহুবার মৃত্যু কামনা করতে থাক। বলুন, এটা উত্তম নাকি 'জান্নাতুল খুলদ' তথা চিরস্থায়ী আবাস, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকিদের দেওয়া হয়েছে? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসরত থেকে যা চাইবে তা-ই পাবে। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। (সুরা ফুরকান, আয়াত ১৩-১৬)

৮. জান্নাতুল আদন : (হে নবী!) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, এটা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন। এরপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যাচারী, কতক মধ্যমপন্থি এবং কতক আল্লাহর ইচ্ছায় সৎকর্মে অগ্রগামী। এটাই (আল্লাহর) মহা অনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে 'জান্নাতুল আদন' তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাতে। সেখানে তাদের স্বর্ণনির্মিত কঙ্কন ও মুক্তা দ¦ারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সুরা ফাতির, আয়াত ৩১-৩৩)।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ এবং জান্নাত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো আল্লাহর হুকুম ও রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর মহান রবের আনুগত্য ও দীনের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। আল্লাহ এ সম্পর্কে কোরআনে ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত- এটার বিনিময়ে। (সুরা তওবা, আয়াত ১১১)

আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান:

আল কুরআন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম বা বাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। সে দায়িত্ব যেন মানুষ সঠিকভাবে প্রতিপালে সক্ষম হয় সে জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূল, নাজিল করেছেন কিতাব।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদি পিতা আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণ (তাকভিনিয়াত) সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চা করেছেন অধিক হারে। হজরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে (তাশরিইয়াত) বিধিবিধান ব্যাপকতা লাভ করে।

আল কুরআন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম বা বাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। সে দায়িত্ব যেন মানুষ সঠিকভাবে প্রতিপালে সক্ষম হয় সে জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূল, নাজিল করেছেন কিতাব।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদি পিতা আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণ (তাকভিনিয়াত) সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চা করেছেন অধিক হারে। হজরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে (তাশরিইয়াত) বিধিবিধান ব্যাপকতা লাভ করে।

আল কুরআন কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়; কিন্তু এতে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব। আল কুরআন কোনো সাহিত্যকর্ম নয়; কিন্তু এতে রয়েছে সাহিত্যের সব রসদ। আল কুরআন কোনো গল্প-উপন্যাস নয়; কিন্তু এতে রয়েছে জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাহিনি।

আল কুরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়; কিন্তু এতে রয়েছে কালোত্তীর্ণ অমর মহাকাব্যের সব ধরনের উপাদান। আল কুরআন জীবন্ত মুজিজা।

মানুষের জীবন চলার পথে পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ইতিবাচক ও কল্যাণকর রূপে ব্যবহারের পরিশীলিত সুবিন্যস্ত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আল কুরআন শ্রেষ্ঠতম মহাবিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন-‘শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।’ (৩৬:২)।

কুরআনে হাকিমের প্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ আয়াতেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে : ‘পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়; আর তোমার রব মহীয়ান; তিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন, মানুষকে তা শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।’ (৯৬:১-৫)।

বিজ্ঞানীরা তাদের নানা আবিষ্কারে কুরআন থেকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন; তাদের তথ্য ও তত্ত্বগুলো কুরআনিক সূত্রের অনুকূলে এসেছে। বিশ্বের বহু সেরা সেরা বিজ্ঞানী কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

যেমন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলী, যিনি ‘বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান’ নামক একটি বই লিখেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো ও কুরআন পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। এতকাল যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের সেসবের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো প্রমাণ করে এটি আসমানি কিতাব।

আল কুরআনে রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞান সব মৌলিক বিষয়। যেমন- জ্যোতিষ শাস্ত্র, বিশ্ব সৃষ্টি ও মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাংগ) প্রসঙ্গ, ছায়াপথ সৃষ্টির আগে প্রাথমিক গ্যাস পিণ্ড, পৃথিবীর আকার গোল। আছে পদার্থবিজ্ঞান, পানিবিজ্ঞান, পানিচক্র, বাষ্পে পরিণত হওয়া। আছে ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, পাহাড় পর্বতের রহস্য, মহাসাগর, মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির বিবরণ এবং রয়েছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান। রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান, পাখির উড্ডয়ন, মৌমাছির দক্ষতা, মাকড়সার জাল, পিপিলিকার জীবনধারা ও যোগাযোগ। আছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধ ও পথ্য। রয়েছে শরীরতত্ত্ব, রক্ত চলাচল, দুগ্ধ ও ভ্রূণতত্ত্ব এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও আঙুলের ছাপ ইত্যাদি।

ভ্রূণতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের জটিলতম একটি বিষয়। আল কুরআনে ভ্রূণ সৃষ্টি ও এর বিকাশ সম্পর্কিত যথাযথ বর্ণনা রয়েছে। ‘আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপিঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে তাকে রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদের

পুনরুত্থিত করা হবে। আমি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সাজিয়েছি, অমি সৃষ্টির বিষয়ে বেখবর নই।' (২৩:১২-১৭)।

কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, শীর্ষস্থানীয় ভ্রূণতত্ত্ববিদদের অন্যতম কিথ মুর, কুরআনের এসব বক্তব্য ও সহিহ হাদিসের বিবরণ সম্পর্কে বলেন, 'উনিশ শতক পর্যন্ত, মানবীয় বিকাশের ধাপগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দিকে বর্ণমালার প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে মানব ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করা হয়।

ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান এবং ফিলাডেলফিয়ারটমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল বাও ইনস্টিটিউটের পরিচালক মার্শাল জনসন বলেন, 'বিজ্ঞানী হিসাবে আমি ভ্রূণতত্ত্ব এবং ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি বুঝতে পারি। আমাকে যদি আমার আজকের জ্ঞান ও বর্ণনার যোগ্যতাসহকারে সেই যুগে স্থানান্তর করা হয়, কুরআনে যে বর্ণনা রয়েছে সেভাবে বর্ণনা করতে পারব না।'

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম সাফল্য মহাকাশবিজ্ঞান। এ বিষয়ে আল কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?' (২১:৩০)। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিগ-ব্যাং' তত্ত্বের অনুরূপ। পানি থেকে জীবন সৃষ্টির উল্লেখ হয়েছে এটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। সব জীবিত প্রাণী প্রটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি, যার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই পানি।

অধুনা বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাজগৎ সদা সম্প্রসারণশীল। এ প্রসঙ্গটিও আল কুরআনে রয়েছে- 'আমি আমার ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমিই একে সম্প্রসারিত করছি।' (৫১:৪৭)।

মহাবিশ্বে সবকিছুই ঘূর্ণায়মান বা চলমান। এ বিষয় সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা : 'আল্লাহই দিন ও রাত করছেন, সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র ও সূর্য। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গতিতে কক্ষপথে সন্তরণ করছে।' (৩৬:৩৮-৪০)। 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার তিথি নির্দিষ্ট করেছেন।' (১০:৫)। কুরআনে সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে যা স্বীয় আলো, আর চন্দ্রকে 'নূর' বলা হয়েছে যা অন্য উৎস থেকে ধার করা। ভূ-

তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আল কুরআনে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে-‘আমি কি ভূমিকে বিছানা ও পর্বতকে কীলক সদৃশ করিনি?’ (৭৮:৬-৭)।

কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন ও এনাটমি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান টিভিএন পারসাদ বলেছেন-‘মুহাম্মাদ একজন সাধারণ লোক ছিলেন, তিনি পড়তে জানতেন না, লিখতে পারতেন না, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি তা হলো চৌদ্দশ বছর আগে এ নিরক্ষর লোক এমন গভীর কিছু উচ্চারণ করেছিল, যা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক। এতে অসংখ্য সঠিক ব্যাপার রয়েছে, আমার মনে কোনো সংশয় নেই এ সত্য স্বীকার করতে যে কোনো ঐশী প্রেরণা বা ওহি তাঁকে এই বক্তব্যগুলো দিতে নির্দেশ দিয়েছে।’

কুরআন মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম মুজিজা মহান আল্লাহর কুদরতের মহানিদর্শন। ‘আমরা তাদের আমাদের নিদর্শন দেখাব দূরদিগন্তে এবং তাদের মধ্যে যতক্ষণ না তারা জানতে পারে যে, এটাই সত্য।’ (৪১:৫৩)। কুরআন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। ‘তারা কি সূক্ষ্মভাবে কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে হতো, তারা এতে বহু অসামঞ্জস্য খুঁজে পেত।’ (৪:৮২)।

কুরআনের আলোকে মানবজীবনের অতীত বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটি শিরোনাম মানব জীবনের অত্যন্ত জরুরি তিনটি অধ্যায়। জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশে থাকে এই তিন অধ্যায়ের ভাব, মর্ম ও রহস্য। অতীত থেকে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে লালন করে। এরপর সেই অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের সমন্বয়ে যাপন করে বর্তমান। জীবন যতদিন আছে, ততদিনই থাকবে এই অর্জন ও সমন্বয়ের শুভ মিলন।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটা অর্থ সমাজে প্রচলিত এবং সবার কাছে পরিচিত। সেই অর্থের স্পষ্টতা ও প্রকাশ্যতা এতটাই দিব্য যে, তার কারণে অন্য কোনো অর্থ খুব সহজে মনে আসে না। সুদূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যত এবং প্রকৃত অতীত ও প্রকৃত ভবিষ্যত স্মৃতিতে জাগরূক থাকে না। অথচ সফল বর্তমান যাপনের জন্য সেই অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনতা খুব জরুরি।

প্রত্যেক মানুষের সুদূর অতীত হল তার জন্মপূর্ব অবস্থা। সুদূর ভবিষ্যত হল তার মৃত্যু-পরবর্তী জীবন। এই দূর অতীত ও দূর ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা ও না জানায় অনেক পার্থক্য হয় দুনিয়ার জীবন যাপনে।

কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায়- প্রতিটি মানুষ প্রথমে ছিল রূহের জগতে। এরপর মায়ের উদরে। তারপর দুনিয়াতে। এরপর দুনিয়ার এই জীবন পার করে সবাইকে যেতে হবে আখেরাতে। কবর জগৎ বা আলমে বরযখে এবং হাশর-নশরের পর জান্নাত কিংবা জাহান্নামে।

রূহের জগৎ ও মায়ের উদর হল মানব জীবনের অতীত। দুনিয়ার জীবন বর্তমান। আর আখেরাতের জীবন ভবিষ্যত।

স্বীকৃত কথা যে, সফল বর্তমান যাপনের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি অতীত থেকে যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ এবং আগত প্রতিটি ভবিষ্যত নিয়ে সঠিক ও সুন্দর স্বপ্ন দেখা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। তাই দূরদর্শী ও পরিণাম-সচেতন সকলেই অতীত জীবনকে খুব গুরুত্ব দেন। ভবিষ্যত জীবন নিয়ে যথেষ্ট ভাবেন।

কুরআন মাজীদে মানব জীবনের অতীত

মানব জীবনের অতীত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

(হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিন।) যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানালেন। (তিনি বললেন,) 'আমি কি তোমাদের রব নই?'
সকলে উত্তর দিল, হাঁ অবশ্যই, আমরা (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি।
(এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছি,) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। -সূরা আরাফ (৭) : ১৭২
এটা ছিল মানব জীবনের দূর অতীতের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল মায়ের উদর।
এসম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। এরপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে রাখি একটি সংরক্ষিত স্থানে (মায়ের গর্ভে)। তারপর সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তর করি। এরপর অস্থিসমূহকে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি।
বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান। -সূরা মুমিনূন (২৩) : ১২-১৪

অন্যত্র বলেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا .

হে মানুষ! যদি পুনর্জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর এমন এক মাংসপিণ্ড থেকে, যা (কখনো) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনো) পূর্ণাকৃতি হয় না। তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য [যে, তোমাদের মূল কী ছিল? এবং কতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা মানুষরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছ।]
আর আমি যাকে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। অনন্তর (তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।

তোমাদের কতককে (আগে আগেই) মৃত্যু দেওয়া হয় আর কতককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে। এমনকি তখন সে সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না।
(অর্থাৎ, অতিরিক্ত বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ শৈশবকালের মতোই বোধ-বুদ্ধিহীনতার দিকে ফিরে যায়। যৌবনকালে সে যা-কিছু জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করে বৃদ্ধকালে তার সব অথবা বেশির ভাগই ভুলে যায়।)। -সূরা হাজ্ব (২২) : ৫
এই আয়াতে মানুষের অতীত এবং অতীত থেকে বর্তমানে আসার প্রসঙ্গকে একীভূত করে তুলে ধরা হয়েছে। সেইসাথে ইঙ্গিত করা হয়েছে প্রকৃত ভবিষ্যতের দিকে। বরং প্রকৃত ভবিষ্যতকে স্পষ্ট করার জন্যই অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন-
বস্তুত এটাই সেই বিষয়, যা বুঝতে পারলে (জীবন ও জগতের) অনেক সত্য ও রহস্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। এবং মৃত্যুর পর যে পুনরুত্থান সম্ভব সেটা (খুব সহজেই) বুঝে আসবে। -তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৪৪২

চারপাশের বাস্তবতা

পৃথিবীর বড় থেকে বড় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ব্যাপকভাবে তারা মানুষের বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমান মানে পৃথিবী। বর্তমান জীবন মানে পৃথিবীর জীবন। বলা হয়, এই জীবনে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও অধিকার পাঁচটি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। তাই শ্রেণি জাতি নির্বিশেষে প্রায় সকল মানুষ এ বিষয়গুলো নিয়েই ব্যস্ত। বড় বড় দার্শনিক বুদ্ধিজীবী, বড় বড় দল ও নেতৃবৃন্দ এবং বড় বড় মিল ও কারখানা এই পাঁচটি বিষয় নিয়েই হাজারো রকমের আয়োজন করে। তারা পুরো দুনিয়াকে কেবল এই পাঁচটি বিষয়ের আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দিতে চায়। সবাইকে এ বিষয়গুলোতেই সচেতন রাখার চেষ্টা করে। চারপাশে একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়- কেবলমাত্র খাদ্য আর বস্ত্র উৎপাদন কিংবা প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে কত অসংখ্য মিল কারখানা তৈরি হয়েছে। বাসস্থান তৈরির কত হাজার পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রতি যুগেই আগের যুগকে ছাড়িয়ে গেছে। বাকি রইল শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল বিষয়গুলো কী? কয়টি বিষয় দুনিয়ার আয় উপার্জন এবং খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক আর কয়টি বিষয় নৈতিক, মানবিক, সভ্যতা,

শিষ্টতা ও আত্মিক উন্নতিকেন্দ্রিক? অন্তত আমাদের দেশের শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কী বোঝা যায়?

জীবন ও জগতের মূল চেতনা ও প্রেরণা কি শুধুই দুনিয়া তথা বর্তমান কেন্দ্রিক! তাহলে অতীত ও ভবিষ্যতের ফিকির কোথায়? অতীত থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বিষয় কোথায়? ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও প্রস্তুতি কোথায়?

নিশ্চিত আগত ভবিষ্যত থেকে আত্মগোপনের সুযোগ তো কারোই নেই!

কুরআন মাজীদে মানব জীবনের বর্তমান

আমাদের সারাজীবনের ব্যস্ততা যেই বর্তমানকে নিয়ে সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কী ইরশাদ হয়েছে একটু পড়ে দেখুন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে-অন্যের চেয়ে এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতা।

(দুনিয়ার জীবনের) উপমা হল বৃষ্টি, যা দ্বারা উদ্গত ফসল কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে দেয়, এরপর তা তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারপরে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা (দলিত) খড়কুটা হয়ে যায়। আর আখেরাতে আছে (একদিকে) কঠিন শাস্তি এবং (অপরদিকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। -সূরা হাদীদ (৫৭) : ২০

এই আয়াতে খুব সংক্ষেপে দুনিয়াবী জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ ও আকর্ষণের বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ করলে দেখা যায়, জীবনের একেক পর্যায়ে মানুষ একেক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। শৈশবে আকর্ষণ থাকে খেলাধুলার প্রতি। যৌবনে সাজসজ্জা ও সুন্দর বেশভূষার প্রতি। আর তখনই সাজসামগ্রী ও অন্যান্য বিষয়ে একে-অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এমনকি তা নিয়ে অহমিকা দেখানোর আগ্রহও জন্মে হৃদয়ে। তারপর আসে বার্ধক্য। তখন মানুষের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় সম্পদ ও সন্তানকে কেন্দ্র করে। তখনকার চেষ্টা একটাই- কীভাবে সম্পদে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে এবং সন্তানের দিক থেকেও অন্যের উপরে থাকবে।

কিন্তু প্রতিটি স্তরে মানুষ যে জিনিসকে আগ্রহ-আকর্ষণ ও কামনা-চাহিদার সর্বোচ্চ শিখর মনে করে, পরবর্তী স্তরে সেটাই তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় মানুষ এই ভেবে হাসতে থাকে যে, আমি এ কোন্ জিনিসকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলাম! অবশেষে যখন আখেরাত আসবে, তখন মানুষ উপলব্ধি করবে, আসলে দুনিয়ার আকর্ষণীয় সবকিছুই ছিল মূল্যহীন। প্রকৃত অর্জনীয় জিনিস তো ছিল এই আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন-

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যার মাধ্যমে জমিনের সেই সব উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে জন্মাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে যখন ভূমি নিজ শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন কোনো এক দিনে বা রাতে তাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না।

এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি সেই লোকদের জন্য, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে। -সূরা ইউনুস (১০) : ২৪

দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার জন্য এই একটি আয়াতই কি যথেষ্ট নয়!

আর যারা কেবলই দুনিয়া কামনা করে এবং দুনিয়াবী জীবনের সুখ সফলতাকেই বড় করে দেখে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যারা (কেবল) দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের পূর্ণ ফল দিয়ে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যে কাজকর্ম তারা করেছিল, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করছে (আখেরাতের হিসেবে) তা না করারই মতো। -সূরা হূদ (১১) : ১৫-১৬

আরও বলেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

নিশ্চয়ই যারা (আখেরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে না, পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে উদাসীন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম- তাদেরই কৃতকর্মের কারণে। -সূরা ইউনুস (১০) : ৭-৮

ভবিষ্যত ও ভবিষ্যত সচেতনতা

সচেতন মানুষমাত্রই ভবিষ্যত সম্পর্কে সজাগ। ভবিষ্যতের চিন্তা ও পরিকল্পনায় দূরদর্শী। ফলে ভবিষ্যতের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য বর্তমানের যে কোনো কষ্ট তারা আগ্রহভরে মেনে নেয়। ভাবে- বর্তমানে একটু কষ্ট হলে হোক, ভবিষ্যতের সুখ নিশ্চিত করতে হবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের সংজ্ঞা কী? আজ সকালের কাছে সন্ধ্যা যেমন ভবিষ্যত, সন্ধ্যার কাছে তেমনি সকাল। চলমান মাসের কাছে আরেক মাস যেমন ভবিষ্যত, আগামী মাসের কাছে তেমনি তার পরের মাস। চলমান বছরের কাছে আগামী বছর যেমন ভবিষ্যত, আগামী বছরের কাছে তেমনি তার পরের বছর। এমনিভাবে শৈশবের কাছে কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য সবই নিকট কিংবা দূরের ভবিষ্যত। এভাবেই জীবনের কাছে মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী সময়ের প্রতিটি ধাপ হল ভবিষ্যত।

কেউ যদি সকালবেলা কেবলই সন্ধ্যা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, পরবর্তী ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই না ভাবে, একমাসে না ভাবে আরেক মাসের কথা, এমনকি বর্তমান সময়ে না ভাবে আগত বছর ও আগত জীবন সম্পর্কে- সবাই তাকে নির্বোধ বলে ধারণা করে। অসচেতন, অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী মনে করে। তাহলে যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে আখেরাত নিয়ে ভাবে না- সে কি বোকা নয়? আখেরাত কি তার ভবিষ্যত বরং প্রকৃত ভবিষ্যত নয়!

কুরআন মাজীদে মানব জীবনের ভবিষ্যত

মানব জীবনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا اِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ.

হে মানুষ! নিজ প্রতিপালক (এর অসন্তুষ্টি) থেকে বেঁচে থাক এবং সেই দিনকে ভয় কর, যখন কোনো পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে না এবং কোনো সন্তানও তার পিতার কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে না পারে এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান)-ও যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে। -সূরা লুকমান (৩১) : ৩৩

বর্তমানের সুখ ও সুবিধা দেখে অসচেতন লোকেরা ধোঁকায় পড়ে। অদূরদর্শী লোকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তাই আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য সব ধোঁকার সামগ্রী।

এমনিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তাই তার ধোঁকা-প্রতারণা থেকেও সচেতনভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

পাশাপাশি তিনি মানুষকে আদেশ করেছেন চিরস্থায়ী সফলতা তথা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে। আদেশ করেছেন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া যাবতীয় ভুলভ্রান্তি থেকে ক্ষমার দিকে ধাবিত হতে। ইরশাদ করেছেন-

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

তোমরা অগ্রগামী হও আপন রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য। যা প্রস্তুত করা হয়েছে এমন লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে চান দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। -সূরা হাদীদ (৫৭) : ২১

দুনিয়া ও আখেরাতকে একসঙ্গে তুলনা করে বলেছেন-

وَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

তোমাদেরকে যা-কিছুই দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার শোভা মাত্র। আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? -সূরা কাসাস (২৮) : ৬০

সেইসাথে পরম আশ্বাস ও সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই খানিকটা দান করি। আর আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই। -সূরা শূরা (৪২) : ২০

হাশরের মাঠের এক বিবরণ প্রসঙ্গে আরও কঠিনভাবে বলেছেন-

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى، وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى، فَاَمَّا مَنْ طَغٰى، وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا، فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى، وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

অতঃপর যখন মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে। যেদিন মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। তখন যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করেছিল এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা থেকে বিরত রাখত, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। -সূরা নাযিয়াত (৭৯) : ৩৪-৪১

এত পরিষ্কারভাবে জীবনের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত ও প্রত্যেকটির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, কোথাও কোনো দ্ব্যর্থবোধকতা নেই। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। পাশাপাশি প্রত্যেকটির পরিণাম ও প্রকৃত পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। যার পরে কোনোভাবেই এগুলোকে অবজ্ঞা অবহেলা করার সুযোগ নেই।

না। দুনিয়ার জীবনকেও অবহেলা করতে বলা হয়নি। দুনিয়ার জীবনকে অগুরুত্বপূর্ণও বলা হয়নি। বলা হয়েছে- কেবলই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত না হতে এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য না দিতে। কারণ দুনিয়াতে মানুষকে পাঠানোই হয়েছে আখেরাতের জন্য। আখেরাতের সফলতা অভিমুখে জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। সুতরাং প্রাধান্য দিতে হলে আখেরাতকেই দিতে হবে। তুলনা করতে হলে ভবিষ্যতকেই গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। সেটাই হবে সচেতনতা ও দূরদর্শিতা।

কুরআন মাজীদের ইরশাদ-

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا، وَ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّ اَبْقٰی، اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُوْلٰی،صُحُفِ اِبْرٰهِیْمَ وَ مُوْسٰی.

কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ আখেরাত বেশি উৎকৃষ্ট ও বেশি স্থায়ী। নিশ্চয়ই এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানী) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে। ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে। -সূরা আলা (৮৭) : ১৬-১৯

আমাদের উচিত নিয়মিত এই বিষয়গুলো হৃদয়ে জাগরূক রাখা। সচেতনভাবে ভবিষ্যতের পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া। সৎকর্মশীল হওয়া। উত্তম আমল ও উন্নত আখলাকের অধিকারী হওয়া। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে যতেœর সাথে পালন করা। এভাবে জীবন নির্মাণ করলে দুনিয়ার জীবন যেমন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের হবে। আখেরাতের জীবনও হবে স্থায়ী সফলতায় চির সুখময়। জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রকৃত অর্থেই সাফল্যমণ্ডিত হবে। সার্থক হবে অতীত ও অতীতের শিক্ষা?

কোরআনের মৌলিক আলোচ্য বিষয় :

কোরআন মাজিদে পাঁচ ধরনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, কোরআন পাঁচ বিষয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ১. হালাল ২. হারাম ৩. মুহকাম ৪. মুতাশাবিহ ও ৫. আমসাল বা উপমা।

অতএব, তোমরা হালালগুলো মেনে চলো, হারাম থেকে বিরত থাকো, মুহকামের অনুসরণ করো, মুতাশাবিহের প্রতি বিশ্বাস রাখো এবং আমসাল বা উপমা থেকে উপদেশ গ্রহণ করো। (বায়হাকি)

১. হালাল : হালাল হলো ওই সব নির্দেশিকাসংবলিত আয়াত, যেগুলোর মধ্যে করণীয় কাজের আদেশ করা হয়েছে। এগুলো চার ভাগে বিভক্ত। ক. ঈমান ও আমল বিষয়ক খ. অন্যের হক ও অধিকার বিষয়ক গ. আখলাক ও নৈতিকতা বিষয়ক ঘ. আদব ও শিষ্টাচার বিষয়ক।

২. হারাম : হারাম হলো যেসব কাজ করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। কোরআনে হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে বিভিন্ন গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে। যেমন—মুনকার বা অসৎ কাজ। ফাহশা বা অশ্লীলতা, সাইয়্যিয়া বা মন্দকর্ম, খতা বা ভুল, অপছন্দনীয়, মাকরুহ বা ত্রুটি, ইছম বা পাপ, উদওয়ান বা বাড়াবাড়ি ইত্যাদি।

হারাম বা নিষিদ্ধ কাজগুলো প্রধানত দুই প্রকার। ১. কবিরা ও সগিরা।

হালাল বা আদিষ্ট কাজগুলো সাধ্যমতো করতে হবে। আর হারাম ও নিষিদ্ধ কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

৩. মুহকাম : মুহকাম অর্থ সুস্পষ্ট, বোধগম্য, মজবুত ইত্যাদি।

মুহকাম আয়াতকে আল্লাহ তাআলা উম্মুল কিতাব তথা কোরআনের আসল (মূল) বিষয় বলেছেন। কেননা এসব আয়াত আসমানি শিক্ষার মূল ভিত্তি।

৪. মুতাশাবিহ : মুতাশাবিহ অর্থ অস্পষ্ট ও রূপক। যেমন—কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, দাজ্জাল বের হওয়ার কথা, কোরআন মাজিদের সুরার প্রথমে বর্ণিত বিচ্ছিন্ন অক্ষর ইত্যাদি। এসব আয়াতের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এগুলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর মধ্যকার গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে

সর্বসাধারণ অবগত হতে পারে না। বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বৈধ নয়। এগুলোর মমার্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তবে না জানলেও এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের মূল। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা এর রূপকগুলোর অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৭)

৫. আমসাল : আমসাল শব্দটি মাসাল-এর বহুবচন। এর অর্থ উপমা, উদাহরণ, প্রবচন, আদর্শ, সদৃশ, নিদর্শন, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। আল-মাওয়ারদি (রহ.) বলেন, উপমা কোরআনের অন্যতম বৃহৎ অংশ, অথচ মানুষ তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। মানুষ এগুলোর নিগূঢ় অর্থ বুঝে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, উলুমুল কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা কোরআন গবেষকের জন্য ওয়াজিব।

উপমার উদাহরণ :

১. 'আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে মশা বা তদূর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা উপস্থাপনে লজ্জাবোধ করেন না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৬)

২. 'আর কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোনো জীবকে আহ্বান করছে, যা হাঁকডাক আর চিৎকার ছাড়া কিছুই শোনে না।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭১)

৩. 'আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসুলরা আগমন করেছিলেন।' (সুরা : ইয়াসিন, আয়াত : ১৩)

কোরআনে মোট ১৭৯ উপমা রয়েছে (মুজামুল মুফহারিস লি আলফাজিল কোরআন, মুহাম্মদ ফুআদ আবদুল বাকী)

এসব উপমা ও উদাহরণের উপকারিতা হলো, উপদেশ দান, উৎসাহিত করা, ভীতি প্রদর্শন, দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা, আসল ভাব উদ্ধার করা, মূল বিষয়ের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করা ইত্যাদি। তা ছাড়া কোরআনের উপমাগুলো প্রশংসা, নিন্দা, বিনিময়, শক্তি, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কিংবা তুচ্ছ করা ইত্যাদি নানাবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

সন্তানকে কুরআন শিখানোর গুরুত্ব:

ছেলে-মেয়েদেরকে যদি সময়াভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা না-ও দেওয়া যায়, তবে (পারা বা সূরা) যতটুকু হউক না কেন, তাই শিক্ষা দেওয়া নেহায়েত দরকার। যদি হিফজ করতে পারে, তবে তো অফুরন্ত ফযীলত।

অনেক মুসলমান নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা দেওয়াটা অধিক গুরুত্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কুরআন সহীহ-শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, একই সাথে কুরআনের প্রতি আদবের শিক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বহীন।

বর্তমানে মুসলমানদের ঘর ও মসজিদ তিলাওয়াত শূন্য হয়ে গেছে। গুনাহের আসবাব দ্বারা ঘর, দোকান-পাট ভরে গেছে। একসময় মুসলমানদের ঘর-বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। সেখান থেকে এখন আসছে গান-বাদ্যের আওয়াজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বরকতের জন্য কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করা হতো। এখন দোকান-পাটে টি.ভি. ও ভি. সি.ডি. এবং বাদ্য-বাজনার মাধ্যমে উন্নতি কামনা করা হয়। মসজিদে কুরআন মাজীদ থাকলে তা তালাবদ্ধ আলমারিতে রাখা হয়। অনেক স্থানে শুধু ব্যবস্থাপনার কারণে তিলাওয়াতের সুযোগ হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মসজিদে বা ঘরে কুরআনকে ধরা ছোঁয়ার কেউ নেই। অথচ মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা মসজিদে নববীর সুফফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ কর যে, সকাল বেলা বতহান বা আকীক নামক বাজারে যেয়ে কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে দু'টি অতি উত্তম উটনী নিয়ে আসবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত পড়া বা দু'টি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দু'টি উটনী হতে এবং তিনটি আয়াত

তিনটি উটনী হতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হতে উত্তম এবং ঐগুলোর সমপরিমাণ উট হতে উত্তম। -মুসলীম, আবু দাউদ

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّار

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়বে এবং তা হিফজ করবে এবং তার হালালকৃতকে হালাল ও হারামকৃতকে হারাম জেনে চলবে, (অর্থাৎ, কুরআনের খেলাফ যেন কোনো আকীদা না হয়। উপরে আমলের কথা বলা হয়েছিল, এখানে আকীদার কথা বলা হলো।) আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্থান দিবেন এবং তার আত্মীয়বর্গের মধ্য হতে দশজন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে ছিল।' -তিরমিযী

এই হাদীসে কুরআন শরীফ হিফজ করার ফযীলত আরো বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মা-বাবা। অতএব, মা বাবার জন্য যে সুপারিশ ও বখশিশ হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নাই। নিজের ছেলেকে হাফেজ বানাবে যে কত বড় ফযীলত তা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جِلَائُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ. بيهقى

'পানি লাগলে লোহায় যেরূপ মরিচা ধরে, সেই রকম মানুষের দিলেও মরিচা ধরে। (মজলিস হতে) আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেই জিনিস কি যাদ্বারা দিলকে সাফ করা যায়? রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করলে এবং কুরআন শরীফ পড়তে থাকলে। (দিল সাফ থাকে, মরিচা ধরে না)।' -বায়হাকী

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْعَرَبِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اقْرَؤُوْا فَكُلٌّ حَسَن

'হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমতাবস্থায় তাশরীফ আনলেন, যখন আমরা কুরআন শরীফ পাঠ করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল। (আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আরবী লোক ছিল, তারা কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়তে পারত, আর কয়েকজন পাড়াগাঁয়ের লোকও ছিল, যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারত না।) হযরত বললেন, পড়তে থাক, সবই ভাল।'

অর্থাৎ চেষ্টা করতে থাক যদি তা সত্তে¡ও ভালো পড়তে না পার তাতে মন ছোট করো না, আর যারা ভালো পড়তে পারে, তারা যেন তোমাদেরকে ঘৃণা না করে। (আল্লাহ তা'আলা দিল দেখেন।) একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, 'জবান (মুখ) সাফ নয় বা বয়স বেশি হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় সহীহ করে (শুদ্ধ করে) পড়তে পারা যাবে না, সুতরাং সওয়াব কি হবে? বরং গোনাহ (পাপ) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' এমন মনে করা উচিত নয়। বরং রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে সান্তনা দিয়ে পড়তে বললেন।

মিশকাত শরীফে আছে-

مَنِ اسْتَمَعَ اِلٰى اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتَبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ مُّضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি আয়াত শুনার জন্যও কান লাগাবে অর্থাৎ মনোযোগের সাথে শুনবে, তাকে এমন একটি নেকি (পূণ্য) দেওয়া হবে, যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (কতদূর যে বাড়বে তার কোন সীমা নির্দেশ করেন নাই। অতএব, আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরবারে আশা করা যায় যে, ইহা ধারণাতীত বাড়বে।) আর যে ব্যক্তি সে আয়াতটি পাঠ করবে, তার জন্য সেই আয়াতটি কিয়ামতের দিবসে একটি উজ্জল নূর হবে।' আহমদ

কুরআন শরীফ কত বরকতের জিনিস। যদি নিজে পড়তে না পারে, তবে কোনো কুরআন পাঠকের পড়ার দিকে কান লাগিয়ে শুনলেও বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। হে আল্লাহর বান্দা! ইহা তো কিছুই কঠিন নয়। (এখনও জাগ, আখেরাতের জন্য একটু চিন্তা কর, অলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ কর, আর ঘুমে বিভোর থেকো না।)

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اِقْرَؤُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِه – مسلم

'(হে আমার উম্মতগণ!) তোমরা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করতে থাক; কেননা যারা কুরআন শরীফ সর্বদা তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফ তাদের জন্য সুপারিশ করবে (তাদেরকে দোযখ হতে বাঁচিয়ে দিবে)।

রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

يَجِيْئُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ يَا رَبِّ حَلِّه فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَيُرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ اِقْرَأْ وَارْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةٌ- ترمذى

কুরআন শরীফ পাঠকারীগণ কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহর দরবারে আসবে, তখন কুরআন শরীফ বলবে, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে সম্মানের লেবাস

পরিধান করান। অতঃপর তাদেরকে বড় সম্মানের তাজ পরান হবে। অতঃপর কুরআন শরীফ পুনরায় বলবে, ‘হে আল্লাহ! তাদেরকে আরো দিন।’ তখন তাদেরকে আরো সম্মানের লেবাস পরান হবে। পুনরায় কুরআন শরীফ বলবে, ‘হে আল্লাহ! আপনি তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান।’ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং বলবেন: ‘কুরআন শরীফের এক একটি আয়াত পাঠ করো এবং এক একটি উচ্চ দর্জায় আরোহণ করতে থাক।’

অন্য এক হাদীসে এই পড়া এবং উপরের দর্জায় চড়ার বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে। যা এরূপ: ‘যে ভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পড়তে সেই রকম পড়তে ও চড়তে থাকো; যে আয়াতে গিয়ে তোমার পড়া শেষ হবে সেখানেই তোমার থাকার স্থান।’

হে মুসলমানগণ!

এই সকল হাদীস খুব চিন্তার সাথে পাঠ করুন। কুরআন শরীফ অমূল্য রত্ন , যত্নের সাথে শিক্ষা লাভ করুন এবং নিজের ছেলে-মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন। যদি সহীহ করে পড়তে না পারা যায়, তবে ঘাবরানোর কোনো কারণ নাই। চেষ্টা করতে থাকলেও বহু সওয়াব পাওয়া যাবে। যদি হিফজ (কণ্ঠস্থ) না হয়, তবে দেখে দেখে পড়তে ও পড়াতে থাকবে। তাতে অনেক ফযীলত হাসিল হবে। যদি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা লাভ করার সময় ও সুযোগ না ঘটে, তবে যারা সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের নিকট বসে শুনলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

সকলেরই জানা আছে যে, যে সকল কাজ অত্যন্ত দরকারী তা করাতে সওয়াব পাওয়া যায়, অথচ তা হাসিল করার উপায়গুলি অর্জন করা যেমন জরূরী বা দরকারী, তেমন তাতে অফুরন্ত সওয়াবও নিহিত আছে।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত এর ফজিলত :

সুরা ফাতিহা পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, **‘সূরা ফাতিহার অক্ষর** শব্দ পড়াতে যেমন শেফা আছে তেমনি লেখাতেও শেফা আছে। যে কোনো ধরনের রোগ চাই দ্বীনি হোক কিংবা পার্থিব, অনুভবযোগ্য হোক বা না হোক সব কিছু এ সূরা পড়া বা লেখার বরকতে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য হবে।’ -(মিরকাতুল মাফাতিহ)**এ বিষয়ে হজরত আবদুল মালেক ইবনে ওমায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতেহা সব রোগের মহৌষধ।’- (সুনানে দারেমি, হাদিস ৩৪১৩; মিশকাত, হাদিস ২১৭০)।**

হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, কয়েকজন সাহাবি আরবের এক গোত্রে এলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোনো মেহমানদারি করল না। হঠাৎ ওই গোত্রের নেতাকে সাপে কাটে। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কি কোনো **ঔষধ আছে** ?

তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তোমাদের আমাদের **মেহমানদারি করতে হবে।** আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। তারা মেহমানদারি করতে রাজি হল। এ ছাড়া আমরা তাদের কাছে একপাল বকরি চাইলাম। তখন একজন সাহাবি উম্মুল কোরআন অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়ে মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির ক্ষতে মেখে দিলেন। ফলে বিষ নেমে গেল এবং সে **সুস্থ হয়ে গেল**।

সাহাবিরা খাওয়া-দাওয়া করে নবী করিম (সা.)-এর কাছে বকরিসহ ফিরে এলেন। তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন তাদের এ ধরনের কাজ ঠিক হল কি না। নবী (সা.) শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ঠিক আছে বকরিগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও একটি অংশ রেখে দিও।’ (বুখারি, হাদিস ৫০০৬)

হজরত আবু সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা রা: বর্ণিত হয়েছে। একদা হজরত রাসূল সা: বললেন, আমি কি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা শিক্ষা দেবো না? তারপর যখন মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা শেখাবার কথা বলেছিলেন? তিনি বললেন, তা হলো সূরা ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন’। এটিই সেই সাতটি পুনঃ আয়াত এবং আমাকে প্রদত্ত মহা কুরআন। (সুনানে দারেমি. ৪, ২১২২)

সুরা ফাতিহার আমল

সুরা ফাতিহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র রোগের মহৌষধ। বহু হাদিসে সুরা ফাতিহার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

হজরত জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, সুরা ফাতেহা ৪০ বার পাঠ করে পানির ওপর দম করে কোনো জ্বরে আক্রান্ত লোকের মুখমণ্ডলে ছিঁটিয়ে দিলে, এর বরকতে জ্বর দূরীভূত হয়ে যাবে।

- ফজরের নামাজের সুন্নত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার এ সুরা পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে **চোখের ব্যথা দূর হয়**।

- শেষ রাতে এ সুরা ৪১ বার তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাআলা **রিজিক বাড়িয়ে দেন**।

- এ সুরা ৪০ দিন নিয়মিত তেলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করালে আল্লাহ **অসুস্থতা দূর করে দেবেন**। -(বুখারি, ৬/১৮৭)

সূরা বাকারার গুরুত্ব ও উপকার

সুরা বাকারা জিন শয়তানকে বিতাড়িত করে।

– আল্লাহর ইচ্ছায় এই সূরা যাদু বিনষ্ট করে।

– এই সূরা বদনজরের সমস্যা দূর করে। বিশেষত এই সূরার শেষ দুই আয়াত।

আল কুরআন সম্পূর্ণটাই শরীর ও মন-মস্তিষ্কের জন্য শিফা। তবুও বিশেষভাবে এই সূরার ফজিলতে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ফজিলত উল্লেখ করছি-

১/ এই সূরা আকড়ে ধরা, নিয়মিত তিলাওয়াত করা এবং একে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ব্যক্তির নিজের ও তার পরিবার পরিজন, ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ির জন্য বারাকাহ স্বরূপ।

২/ এটি যাদু ও যাদুর উপকরণ বিনষ্টকারী, এবং যাদু থেকে রক্ষার জন্য এই সূরা দূর্গের ন্যায় কাজ করে।

এব্যাপারে আরও হাদিস জানতে চাইলে হাদিসের কিতাব সমূহ যেমনঃ আত তারগীব, শরহুস সুন্নাহ কিংবা এজাতীয় কিতাব সমূহ দেখা যেতে পারে।

এছাড়া সহীহ মুসলিমে বর্নিত হয়েছে রাসূল সাঃ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরসমুহকে কবরস্থান বানিয়ে রেখো না। নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় শয়তানে সেই ঘর হতে পলায়ন করে।"

ঘর বাড়ি, সন্তান সন্তুতি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য এই সূরা বারাকাহ স্বরূপ। এই বারাকাহ তাদেরই অর্জিত হয় যারা নিয়মিত এই সূরা তাদের ঘরে তিলাওয়াত করে, মেনে চলে এবং তা নিয়ে চিন্তাফিকির করে।

এব্যাপারে সহিহ মুসলিমে একটি হাদিস রয়েছে, "তোমরা সুরা বাকারা তিলাওয়াত করো, কারণ এটি আকড়ে ধরা বারাকাহ, একে ছেড়ে দেয়া ক্ষতিগ্রস্থতা এবং বাতিল শক্তি কখনো এর সাথে পেরে ওঠে না।" এখানে বাতিল শক্তি দ্বারা যাদু উদ্দেশ্য।

সহিহ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরেকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাঃ বলেছেন,"প্রতিটি জিনিসেরই একটি কূজ/চূড়া রয়েছে। সূরা বাকারা হচ্ছে কুরআনের চূড়া। কেউ যদি এক রাতে এই সূরা তার গৃহে তিলাওয়াত করে তাহলে শয়তান তিন রাত পর্যন্ত তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।"

ইমাম হাকিম রঃ এই হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং আলবানী রঃ একে হাসান বলেছেন।

এছাড়াও বুখারী শরিফে আবু মাসউদ রা.এর সূত্রে বর্নিত হয়েছে যে, রাসূল সাঃ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতের বেলা এই সূরার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে তার জন্য সেটি যথেষ্ঠ হবে।"

এছাড়াও এই সূরায় রয়েছে আয়াতুল কুরসি। এর ফজিলতে অনেক হাদিস রয়েছে। নাসায়ী ও জামে' সগীরে বর্নিত আছে, রাসূল সাঃ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করে, মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই তার জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা নেই।" (এর সনদও সহীহ)

ইমাম তাবরানী ও নাসায়ি রঃ এর সূত্রে আত তারগিবে আলবানী রঃ আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

"যে ব্যক্তি সন্ধায় আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করবে সে সকাল পর্যন্ত জ্বিনের অনিষ্ট

থেকে হিফাজতে থাকবে। আর সে ব্যক্তি সকালে তা তিলাওয়াত করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিনের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে।“

আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমলের তাওফিক দান করুক। আমিন ৮

আয়াতুল কুরসী এর ফজিলত:

সূরা বাকারাহ'র ২৫৫ নাম্বার আয়াত আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত।আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত নবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ‘আয়াতুল কুরসি’ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না।

(নাসাঈ কুবরা ৯৯২৮)। উবাই ইবনু কা’ব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? আমি বললাম, ‘আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম’ (আয়াতুল কুরসি)। তখন তিনি আমার বুকে (হালকা) আঘাত করে বলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক। (সুনানে আবু দাউদ-১৪৬০)।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের উঁচু চূড়া হলো সূরা আল-বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতগুলোর প্রধান। তা হলো আয়াতুল কুরসি। (জামে আত-তিরমিজি-২৮৭৮)।

আবু লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবি (সা.)-এর নিকট বসে থাকা অবস্থায় এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে বলল, আমার এক অসুস্থ ভাই আছে। তিনি বলেন, তোমার ভাই কী রোগে আক্রান্ত? সে বলল, (কোনো কিছুর) কুপ্রভাব। তিনি বলেন, তুমি যাও এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আবু লায়লা (রা.) বলেন, সে গিয়ে তার ভাইকে নিয়ে এলে তিনি তাকে নিজের সামনে বসান। আমি শুনতে পেলাম, তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত মধ্যখানের দুই আয়াত (১৬৩-১৬৪ নং আয়াত), আয়াতুল কুরসি (২৫৫ নং আয়াত) এবং বাকারার শেষ তিন আয়াত (২৮৪-২৮৬ আয়াত) এবং আল ইমরানের একটি আয়াত, আমার মনে

হয় তিনি ১৮নং আয়াত পড়েছিলেন এবং সূরা আরাফের এক আয়াত (৫৪ নং আয়াত), সূরা মুমিনুনের এক আয়াত (১১৭নং আয়াত), সূরা জিন-এর এক আয়াত (৩নং আয়াত), সুরা সাফফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সুরা হাশরের শেষ তিন (২২, ২৩ ও ২৪) আয়াত, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাকে ফুঁ দিলেন। তাতে বেদুইন এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়াল যে, তার কোনো রোগই অবশিষ্ট নেই (সুনানে ইবনে মাজাহ-৩৫৪৯)।

সূরা বাকারাহ'র শেষ দুই আয়াত এর ফজিলত :

সুরা বাকারা কোরআনুল কারিমের দ্বিতীয় ও বড় সুরা।

আয়াতের মর্যাদাহজরত আয়ফা ইবনু আবদিল কালাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসুল! কোরআনের কোন সুরা বেশি মর্যাদাপূর্ণ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, কোরআনের কোন আয়াত বেশি মর্যাদার? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আয়াতুল কুরসি- 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'। সে পুনরায় বলল, হে আল্লাহর নবি! কোরআনের কোন আয়াত এমন, যার বরকত আপনার ও আপনার উম্মাতের কাছে পৌঁছতে আপনি ভালবাসেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সুরা আল বাকারাহর শেষাংশ। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর 'আরশের নীচের ভাণ্ডার থেকে তা এ উম্মাতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা এতে নেই। (মিশকাত ২১৬৯, দারেমি)অর্থ ও উচ্চারণসহ সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِکَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَ اَطَعۡنَا ٭ غُفۡرَانَکَ رَبَّنَا وَ اِلَیۡکَ الۡمَصِیۡرُ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَ عَلَیۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِیۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعۡفُ عَنَّا ٝ وَ اغۡفِرۡ لَنَا ٝ وَ ارۡحَمۡنَا ٝ اَنۡتَ مَوۡلٰىنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ উচ্চারণ : আমানার রাসুলু বিমা উংঝিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মু'মিনুন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহ। লা-নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া কালু সামি'না ওয়া আত্বা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত

রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন্না সীনা আও আখত্ব’না রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরাং কামা হামালতাহু আলাল্লাজীনা মিং কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাকাতালানা বিহ। ওয়া’ফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা আংতা মাওলানা ফাংসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন।অর্থ : রাসুল তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের আমল ও ফজিলত১. হজরত আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সুরাহ আল-বাকারার শেষের এ দুটি আয়াত পড়বে তা ঐ রাতে সেই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।’ (বুখারি ৪০০৮-৫০০৯, মুসলিম ৮০৮)

২. হজরত নুমান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে তিনি দুটি আয়াত নাজিল করছেন। সেই দুটি আয়াতের মাধ্যমেই সুরা আল-বাকারা সমাপ্ত করেছেন। যে ঘরে তিন রাত এ দুটি আয়াত তেলাওয়াত করা হয়; শয়তান সেই ঘরের কাছে আসতে পারে না।’ (তিরমিজি ২৮৮২)

সূরা তাওবার শেষ আয়াতের ফজিলত :

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা তাওবার শেষ দু'টি আয়াত সাতবার করে পাঠ করবে আল্লাহতায়ালা তার সব কাজ সহজ করে দিবেন। (কুরতুবী)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এ দুই আয়াত পাঠ করে কোনো বিচারকের সামনে যাবে বিচারক তার প্রতি সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। মানুষের কল্যাণে কুরআ নাজিল করা হয়েছে। যা মুমিনের পথ প্রদর্শক এবং সকল সমস্যার সমাধানকারী। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে রয়েছে বিশেষ কিছু আয়াত। তন্মধ্যে সুরা তাওবার শেষ দুই আয়াতও বিদ্যমান। এখানে আয়াতদ্বয় ও তার ফজিলত তুলে ধরা হলো-উচ্চারণ : লাক্বাদ ঝা-আকুম রাসু-লুম মিন আংফুসিকুম আযিযুন আলাইহি মা- আনিত্তুম হারিছুন আলাইকুম বিলমু'মিনি-না রাউ'-ফুর রাহি-ম। ফা ইং তাওয়াল্লাও ফাক্কুল হাসবিয়াল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া হুয়া রাব্বুল আ'রশিল আজি-মি। (সুরা তাওবা : আয়াত ১২৮-১২৯)>> হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি لَقَدْ جَاءَكُم হতে رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم পর্যন্ত প্রত্যেকদিন একশত (১০০) বার পাঠ করবে, সে পার্থিব ও পরকালীন সকল বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাবে।>> অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এ দুই আয়াত পাঠ করে কোনো বিচারকের সামনে যাবে বিচারক তার প্রতি সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।>> অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি এ দু' আয়াত দিনে কমপক্ষে দু'বার পাঠ করবে, সে দিন তার মৃত্যু হবে না।পরিশেষে...আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সুরা তাওবার শেষ দু আয়াতের ফজিলত অর্জনের তাওফিক দান করুন।আমিন

সূরা কাহাফ এর প্রথম ১০ আয়াত এর ফজিলত :

যে ব্যক্তি সূরা আল কাহাফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখা হবে। (মুসলিম) (মিশকাত)। - 'যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য এমন একটি নূর হবে, যা তার অবস্থানের জায়গা থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত করে দিবে

---কিছু কিছু সুরা মুখস্থ করা আবশ্যক, যেমন সুরা ফাতিহা। এই সুরা ছাড়া নামাজ হয় না। আবার কিছু সুরা মুখস্ত করা আবশ্যক না হলেও সেগুলো শেখার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন আবার সুরা কাহাফ। সুরা কাহাফের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে তুমি হয়তো দুঃখে নিজেকে শেষ করে ফেলবে।’

এ সুরার দশম আয়াতে একটি দোয়া আছে। এই দোয়া গুহাবাসী যুবকেরা করেছিল। ‘হে আমাদের প্রতিপালক তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো ও আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করো।’ (*কোরানশরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ*, ‘সুরা কাহাফ’, অনুবাদ: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন)

---রাসুল (সা.) আমাদের সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করতে বলেছেন। হাদিসে আছে, ‘যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।’ (মুসলিম শরিফ)

সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ইসলামের মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে বলা হয়েছে। ‘আর তাদের সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। উদ্ভট কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে।’ (সুরা কাহাফ, ৪-৫)

রাসুলের (সা.)–এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার আলোচনা এসেছে, ‘প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর দাসের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও এর মধ্যে তিনি কোনো অসংগতি রাখেননি।’ (সুরা কাহাফ, ১)

প্রতিদানের কথা এসেছে পরের আয়াতে। তাতে ভয় ও আশা দুটি আবেগই দেখা যায়। ‘তার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আর

বিশ্বাসীগণ যারা সৎকাজ করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য বড় ভালো পুরস্কার রয়েছে।' 'সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।' (সুরা কাহাফ, ২-৩)
কোরআন মুখস্থ করলে ইমান বৃদ্ধি হয়। সুরা আল কাহাফে কয়েকটি গল্প রয়েছে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য বাস্তব পাঠ শেখায় এবং কোরআনের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেমন, 'পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে, এই করার জন্য যে ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো।' (সুরা কাহাফ, ৭)রাসুল (সা.) আমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, 'আদমের সৃষ্টির পর থেকে বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কোনো ফিতনা নেই।' (মুসলিম শরিফ) এটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি ঢাল।সুরা কাহাফে চারটি ঘটনা, চারটি বক্তব্য ও উপদেশ রয়েছে। সুরার **১** থেকে ৮ আয়াতে রয়েছে বক্তব্য। ৯ থেকে ২৬ আয়াতে আছে আসহাবে কাহাফের ঘটনা।

সূরা ইয়াসিন পাঠের ফজিলত :

সূরা ইয়াসিনকে বলা হয় পবিত্র কুরআনের হৃদয়। সুরাটিতে রয়েছে ৮৩টি আয়াত, পাঁচটি রুকু এবং ৭টি মুবিন। কেন সূরা ইয়াসিনকে কুরআনের হৃদয় বলা হয় এ নিয়ে তাফসীরকারকরা বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। সুরাটি ফজিলত সম্পর্কে হাদিসের অনেক বর্ণনা রয়েছে।
হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক বস্তুরই একটা হৃদয় থাকে আর কুরআনের হৃদয় হল সুরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন একবার পড়বে, মহান আল্লাহ তাকে দশবার পুরো কুরআন পড়ার সওয়াব দান করবেন।' (তিরমিজি)
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, 'সুরা ইয়াসিন কুরআনের রূহ বা হৃৎপিণ্ড। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের জন্য সুরা ইয়াসিন পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে মাগফিরাত বা ক্ষমা।

সুরা ইয়াসিন বুঝে পড়ায় রয়েছে অনেক উপকারিতা। এ সুরায় মানুষকে পরকালের প্রস্তুতির দিকে আহ্বান করে। আর পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে।

সুতরাং দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকালের চিন্তার ওপর নির্ভরশীল। এ সুরার নিয়মিত আমলকারীর প্রতি থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারীর কোনো গোনাহ থাকে না। সে দিক থেকে পরকালীন কল্যাণের জন্য সুরা ইয়াসিন বুঝে পড়া খুবই জরুরি।

গোনাহ মাফের মাধ্যম সূরা ইয়াসিন

প্রতিদিনের কাজ-কর্মে মানুষ অনেক ভুল-ত্রুটি করে থাকে। আর এসব ভুল-ত্রুটি করা গোনাহের কাজ। গোনাহ মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। আর জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেক আমল করা।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তার ওই রাতের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন।' (দারেমি)

হজরত ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তার বিগত জীবনের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।' (বায়হাকি,আবু দাউদ)

দুনিয়ার জীবনে সূরা ইয়াসিন পড়লে যে উপকার

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি অভাব-অনটনের সময় সুরা ইয়াসিন পাঠ করে তাহলে তার অভাব দূর হয়, সংসারে শান্তি আসে এবং রিজিকে বরকত হয় ' (মাজহারি)

হজরত আতা বিন আবি রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন আমি শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে, তার সব হাজত (প্রয়োজন) পূর্ণ করা হবে।' (দারেমি)

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘যে ব্যক্তি সকালে সুরা ইয়াসিন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে-স্বস্তিতে থাকবে। যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে।’ (মাজহারি)

মৃত্যুর যন্ত্রণা মুক্ত থাকার মাধ্যম সুরা ইয়াসিন

তাফসিরে জালালাইনের হাশিয়ায় এসেছে, ‘যদি কোনো মুসলমানের মৃত্যুর সময় হয়, আর সে সময় তার পাশে কেউ সুরা ইয়াসিন পাঠ করে, তবে বেহেশত থেকে রেদওয়ান ফেরেশতা জান্নাতের সুসংবাদ না দেয়া পর্যন্ত রূহ কবজকারী ফেরেশতা (মালাকুল মাউত) ওই ব্যক্তির রূহ কবজ করেন না। রূহ কবজের সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি অবস্থান হয় রাইয়্যান নামক জান্নাতে।

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘মৃত্যুশয্যা ব্যক্তির কাছে সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয়ে যায়। (মাজহারি)

হযরত ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এটা (সুরা ইয়াসিন) তোমাদের মুমূর্ষু (মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে) ব্যক্তিদের কাছে পাঠ কর।’ (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত প্রতিদিন সকালে অন্তত একবার এ সুরাটি তেলাওয়াত করা। কেননা এ সুরার তেলাওয়াতকারীকে ইহকাল ও পরকালে ব্যাপক কল্যাণ ও শান্তি দান করা হবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘এ সুরা কেয়ামতের দিন অধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সুপারিশকারী হবে আর আল্লাহ তাআলা তা অবশ্যই কবুল করবেন।

সূরা আর রহমান পাঠের গুরুত্ব ও ফজিলত :

বেশিরভাগ মুসলমান এর অনেক উপকারের জন্য প্রতিদিন সূরা আল-রহমান তেলাওয়াত করে। কিন্তু কি সেই উপকারিতা, যা তাদের প্রতিদিন পড়তে বাধ্য করে? আসুন জেনে নিই প্রতিদিন সূরা আর রহমান পড়ার আসল উপকারিতা। প্রতিদিন সূরা আল-রহমান পাঠ করা আপনাকে ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে আসে, আপনাকে কিছুটা মানসিক শান্তি দেয় এবং আপনার সমস্ত উদ্বেগ দূর করে। আপনি যখন উদ্বিগ্ন এবং চাপ অনুভব করেন, তখন এটি পড়ুন এবং আপনার হৃদয় নিরাময় হবে। সূরা আল-রহমান তেলাওয়াত করা আপনার জীবনে আপনার অনেক নিয়ামত স্বীকার করবে। এটি আপনাকে ঈশ্বরের করুণার কথাও মনে করিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। আর সূরা আর-রহমানকে কোরআনের শোভা বলা হয়েছে। সুবহানআল্লাহ! প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআনের অলংকরণের তাৎপর্য সত্যিই অকল্পনীয়। রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের একটি সাজসজ্জা আছে এবং কোরআনের শোভা সূরা আর রহমান"।

সূরা রহমান সম্পর্কে

সূরা আর-রহমান পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে প্রিয় এবং পঠিত সূরাগুলির মধ্যে একটি। এর গুরুত্ব বোঝা যায় এর নাম "আর-রহমান" যার অর্থ "পরম করুণাময়।" নামটি নিজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করুণাময় প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। এটি তার পাঠকের জন্য প্রচুর সুখ, করুণা এবং প্রশান্তি নিয়ে আসে। এটি পবিত্র কুরআনের ৫৫তম সূরা। এতে ৭৮টি আয়াত এবং মোট ৩৫২টি শব্দ রয়েছে। কিছু মুফাসসিরগণ এটিকে মক্কার সূরা বলে অবিহিত করেন আবার কেউ বলেন এটি মদিনা যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আর-রহমান একজন বিশ্বাসীকে আল্লাহর শক্তির বিস্ময় এবং মহাবিশ্ব এবং তার বাইরের উপর তাঁর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলে। এবং আল্লাহ আমাদের উপর যে অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এটি পরম করুণাময়ের সামনে সমস্ত প্রাণীর অসহায়ত্ব এবং জবাবদিহিতার কথা বলে। فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে" এই আয়াতটি মানুষকে আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে সচেতন করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সূরাতে জালেমদের জন্য কঠোর সতর্কবাণীও রয়েছে। আর আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ফল নাফরমানি করার ফল আল্লাহ তাদের ভোগ করবেন। এবং এটি জান্নাতের আকারে সর্বোত্তম ফলাফলও নির্দিষ্ট করে তার জন্য যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং নিজের বিশ্বাসের প্রতি সত্য।

সূরা রহমানের অর্থ

এই সুন্দর সূরার শুরুর আয়াতটিই শিরোনাম। এটি "আর-রহমান" দিয়ে শুরু হয় যা আল্লাহকে পরম করুণাময়, করুণাময় বা করুণার প্রভু বলে উল্লেখ করে। প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং তাকে অলঙ্কারশাস্ত্র শেখাচ্ছেন।

সূরা রহমান পড়ার উপকারিতা

সূরা রহমান তেলাওয়াতের উপকারিতা অগণিত। পার্থিব জীবনে সমস্যা মোকাবিলার জন্য অনেকে সূরা আর-রহমান মুখস্ত করে এবং তেলাওয়াত করে।

১) দোয়ার জন্য সূরা রহমান -

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা আল আনআমে বলেন:

"এবং এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং এর অনুসরণ কর এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ভয় কর যাতে তোমরা তাঁর রহমত পেতে পার।"

প্রকৃতপক্ষে, সূরা আর রহমান তিলাওয়াত আমাদের শুধু পার্থিব জীবনেই সাহায্য করবে না, আল্লাহর এই বাণী আখিরাতেও সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “কুরআন একজন সুপারিশকারী এবং সত্যবাদী আইনজীবী। যে ব্যক্তি তা নিজের সামনে রাখবে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এটিকে তার পিছনে ফেলে দেবে, এটি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে।"

২) স্বাস্থ্যের জন্য সূরা রহমান -

নিঃসন্দেহে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দের নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। এবং এটা অসংখ্যবার দেখা গেছে যে সূরা আর-রহমান পাঠ করা এবং তেলাওয়াত করা শারীরিক অসুস্থতার উপর অলৌকিক প্রভাব ফেলে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে গুরুতর অবস্থায় নবজাতকদের সূরা আর-রহমান পাঠ করা তাদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি করেছে।

এছাড়াও, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হাইজিন হাইপোথিসিস এবং হার্টের সমস্যার মতো গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে সূরা আর-রহমান পাঠ করলে উন্নতি প্রমাণিত হয়।

৩)মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য সূরা রহমান-

সূরা আর রহমান পবিত্র কুরআনের সেরা সূরাগুলির মধ্যে একটি যা আপনার মন, হৃদয় এবং শরীরকে শান্ত করে। শান্ত প্রভাব আরও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে যখন একজন ব্যাক্তি প্রতিটি আয়াতের অর্থ বোঝার সাথে এটি পাঠ করে। এটি আমাদের উপলব্ধি করে যে আল্লাহ আমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন যেগুলি আমরা গ্রহণ করি।

"নবী (সাঃ) সাহাবীদের কাছে গিয়ে সূরা রহমান তিলাওয়াত করলেন কিন্তু তারা সবাই শান্ত ছিলেন কোন সারা পায়নি। তিনি তখন তাদের বললেন যে তিনি যখন জ্বীনের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে এটি পাঠ করেছিলেন এবং যখন রাসূল (সাঃ) এই সূরার এই আয়াতটি পাঠ করলেন- فَبِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰن ‘আর তুমি প্রভুর কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে’ তখন জিনরা জবাব দিত, ‘তোমার অনুগ্রহের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

৪) বিয়ের জন্য সূরা রহমান পাঠ করা-

একজন মুমিনের দৃঢ় ঈমান তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইচ্ছায় সব কিছু অর্জন করতে পারে। আমাদের হালাল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সূরা আর-রহমান পাঠ করা এবং তেলাওয়াত করা আল্লাহর শক্তিতে অসম্ভবকে সত্য করে তুলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সমস্ত অনুগ্রহের মধ্যে একজন জীবনসঙ্গী পাওয়া। তাই সূরা আর রহমান পড়া, তেলাওয়াত করা এবং মুখস্থ করা আমাদের বিয়ের প্রয়োজন পূরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

৫) সূরা আর রহমান আমাদের চাহিদা পূরণ-

"এবং (মনে কর) যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেব। অতঃপর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আমার শাস্তি কঠিন।" আমাদের প্রভু কতই না করুণাময় যে তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে আমরা তাঁর ইতিমধ্যেই দেওয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর সূরা আর-রহমানের আয়াত "অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে" আমরা কতটা ধন্য তা বোঝার এবং চিন্তা করার জন্য বর্ণনা করে। এবং যখন আমরা তা বুঝতে পারি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তখন আল্লাহ আমাদেরকে আরও নিয়ামত দান করেন।

৬) সুরক্ষার জন্য সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করা-
আল্লাহর প্রতিটি শব্দই একজন মুমিনকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করা খারাপ নজর থেকে মুক্তি, যাদু থেকে সুরক্ষা এবং এর একজন মুমিনকে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।
৭) সফলতার জন্য সূরা আর-রহমান পাঠ করা এবং তেলাওয়াত করা-
আমরা সকলেই জানি যে আমরা যা কিছু অর্জন করি এবং আমাদের সাফল্য কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে। আমরা যখন আমাদের তাওয়াক্কুল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে রাখি তখন আমরা তাঁর ইচ্ছায় যে কোন কিছু অর্জন করতে পারি। আর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সূরা আর রহমান তেলাওয়াত বা মুখস্ত করার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করে আমাদের দিন শুরু করার অভ্যাস গড়ে তুললে তা দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক উপকারী হতে পারে।

সূরা ওয়াকিয়া এর ফজিলত:

পবিত্র কোরআনের ৫৬ নম্বর সুরা আল-ওয়াকিয়া। মক্কায় নাজিল হওয়া এই সুরায় মহান আল্লাহর অনন্ত-অসীম ক্ষমতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।
হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, অগ্রবর্তী দলের পরিচয়, ডান-বাঁ দিকের লোকদের অবস্থান, আমল অনুযায়ী নিয়ামত ও আজাব ভোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
দুনিয়ার কৃষিকাজ, ফসল উৎপাদন, দৃশ্যে জীবনের গুপ্ত রহস্য এবং জান্নাতে সংরক্ষিত হুরদের সৌন্দর্য, নিয়ামত প্রাচুর্যের সুনিপুণ নকশা প্রকাশ করা হয়েছে।
সুরা ওয়াকিয়ার গুরুত্ব-তাৎপর্য সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন! তখন রাসুল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমাকে সুরা হুদ, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা

মুরসালাত, সুরা আম্মা ইয়্যাতাসা আলুন এবং সুরা ইয়াশ শামসু কুউয়িরাত বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩২৯৭)

সুরা ওয়াকিয়ার ফজিলত

হাদিস-তাফসিরের গ্রন্থসমূহে সুরা ওয়াকিয়ার বিভিন্ন ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা, অগ্রবর্তী দলের পরিচয়, ডান-বাঁ দিকের লোকদের অবস্থান, আমল অনুযায়ী নিয়ামত ও আজাব ভোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার কৃষিকাজ, ফসল উৎপাদন, দৃশ্যে জীবনের গুপ্ত রহস্য এবং জান্নাতে সংরক্ষিত হুরদের সৌন্দর্য, নিয়ামত প্রাচুর্যের সুনিপুণ নকশা প্রকাশ করা হয়েছে।

সুরা ওয়াকিয়ার গুরুত্ব-তাৎপর্য সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন! তখন রাসুল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমাকে সুরা হুদ, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা মুরসালাত, সুরা আম্মা ইয়্যাতাসা আলুন এবং সুরা ইয়াশ শামসু কুউয়িরাত বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৩২৯৭)

সুরা ওয়াকিয়ার ফজিলত

হাদিস-তাফসিরের গ্রন্থসমূহে সুরা ওয়াকিয়ার বিভিন্ন ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে তার ওপর অভাব আসবে না। (বায়হাকি, হাদিস : ২৪৯৭, তাফসিরে রুহুল মাআনি : ২/১২৮)

সুরা ওয়াকিয়া কখন পড়তে হয়

দিন রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি সময়। মহান আল্লাহ এ দুই সময়ে জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। মাগরিবের নামাজের পর সুরা ওয়াকিয়া পাঠ করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইসলামী স্কলাররা।

সুরা ওয়াকিয়া শেখা-শেখানো

সুরা ওয়াকিয়া পাঠের বিশেষ একটি শিক্ষা পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সঙ্গে আমিরুল মুমিনিনের বিশেষ কথোপকথন থেকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন ওসমান (রা.) তাঁকে দেখতে গিয়ে বলেন, আপনার অসুখটা কী? ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমার পাপ আমার অসুখ। ওসমান (রা.) বলেন,

আপনার বাসনা কী? তিনি বলেন, আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি। তিনি বলেন, আমি সরকারি বায়তুল মাল থেকে কোনো উপঢৌকনের ব্যবস্থা করে দেব, যা আপনার এবং আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে? ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আমার কন্যাদের সুরা ওয়াকিয়া শিক্ষা দিয়েছি।

আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ওয়াকিয়া পাঠ করে, অভাব তাকে কখনো স্পর্শ করবে না। (তাফসিরে জালালাইন আরবি-বাংলা : ৬/৩৫৩)

সূরা মুজ্জাম্মিল এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

পবিত্র কোরআনের ৭৩ নম্বর সুরা মুজ্জাম্মিল। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ২০। রুকু দুটি।প্রথম আয়াতের মুজ্জাম্মিল শব্দ থেকে এটির নাম দেওয়া হয়েছে। সুরাটির প্রথম রুকুতে রাসুল (সা.)-কে রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ, কোরআন তিলাওয়াত ও কাফিরদের শারীরিক ও মানসিক জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রুকুতে তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান শিথিল করা হয়েছে। এ সুরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো—

সুরা মুজ্জাম্মিলের শানে নুজুল

মক্কার কাফিরদের নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার করেছেন রাসুল (সা.)।

পবিত্র কোরআনের ৭৩ নম্বর সুরা মুজ্জাম্মিল। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ২০। রুকু দুটি।

প্রথম আয়াতের মুজ্জাম্মিল শব্দ থেকে এটির নাম দেওয়া হয়েছে। সুরাটির প্রথম রুকুতে রাসুল (সা.)-কে রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ, কোরআন তিলাওয়াত ও কাফিরদের শারীরিক ও মানসিক জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রুকুতে তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান শিথিল করা হয়েছে। এ সুরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো—

সুরা মুজ্জাম্মিলের শানে নুজুল

মক্কার কাফিরদের নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার করেছেন রাসুল (সা.)।

এতে কাফিররা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা দারুন নাদওয়া সংসদে বসে একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। জাবের (রা.) বলেন, একদিন তারা একত্র হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ (সা.)-এর এমন একটি নাম নির্বাচন করা হোক, যা শুনে বহিরাগত লোক তাঁর কাছে না ভিড়ে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে তাদের কেউ কেউ গণক, পাগল, জাদুকর ইত্যাদি প্রস্তাব পেশ করে।এতে অন্যরা প্রতিবাদ করে। এভাবে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। শেষমেশ বৈঠক এখানে সমাপ্ত হয়। এ সংবাদ শুনে রাসুল (সা.) ভারাক্রান্ত মনে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। ওই সময় সুরাটির প্রথম রুকু অবতীর্ণ হয়। জিবরাইল (আ.) এসে বলেন, হে বস্ত্রাবৃত! রাত জাগরণ করুন কিছু অংশ ছাড়া। অর্ধরাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশি...। প্রথম রুকু অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘ এক বছর পরে দ্বিতীয় রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুরা মুজ্জাম্মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবারা রোজার মাসের মতো রাত জেগে নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সুরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সুরা মুজ্জাম্মিলে প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছর। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩০৫)

তাহাজ্জুদ নামাজের বিধান:

প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুল (সা.)-এর ওপর তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল। পরে ফরজের বিধান রহিত করা হয়। তবু তিনি সারা জীবন গুরুত্বের সঙ্গে তাহাজ্জুদের বিধান পালন করে গেছেন। আম্মাজান আয়েশা (রা.) বলেন, যখন এ সুরার প্রথমাংশ নাজিল হয় (যাতে তাহাজ্জুদ ফরজ হয়) তখন সাহাবায়ে কেরাম এত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ পড়তেন যে তাঁদের পা ফুলে যেত। আর এ সুরার শেষাংশ ১২ মাস পর্যন্ত আসমানে আটকে থাকে। ১২ মাস পর যখন এর শেষাংশ নাজিল হয়, তখন তাহাজ্জুদ নফল হয়ে যায়। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৪২)

কোরআন পাঠ করার নিয়ম:

সুরা মুজ্জাম্মিলে কোরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারতিল ও তাজবিদের সঙ্গে কোরআন পাঠ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে রাসুল! আপনি কোরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। তিনি বরাবর হুকুম পালন করে গেছেন।

রাসুল (সা.) নামাজের কিরাত পরিপূর্ণ ওয়াকফ করে তিলাওয়াত করতেন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) আলাদা আলাদা করে কেটে কেটে কিরাত পাঠ করতেন। তিনি পড়তেন—'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', এরপর থামতেন। 'আর-রাহমানির রাহিম'-এর পরে থামতেন। তারপর তিনি পড়তেন—'মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৯২৭)
তাই যে ব্যক্তি তাজবিদসহ সুন্দর করে কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কোরআন তার ওপর লানত করে। এ জন্য কোরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সবার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সূরা মুলক এর আমল ও ফজিলত :

সুরা আল-মুলক। পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনুল কারিমের ৬৭তম সুরা। আয়াত সংখ্যা ৩০। রুকু ২। কুরআন তেলাওয়াতের আমলকারীদের জন্য সুরাটি অনেক ফজিলতপূর্ণ। যা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত সুপারিশ করত থাকে।

সুরা আল-মুলক। পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনুল কারিমের ৬৭তম সুরা। আয়াত সংখ্যা ৩০। রুকু ২। কুরআন তেলাওয়াতের আমলকারীদের জন্য সুরাটি অনেক ফজিলতপূর্ণ। যা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত সুপারিশ করত থাকে।
মানুষকে গোনাহমুক্ত জীবন দানের জন্য কুরআন সুন্নায় অনেক আমলের বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বনবি। লক্ষ্য একটাই যাতে মানুষ গোনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে পারে। এটিও তার একটি। হাদিসের একাধিক বর্ণনায় এসেছে-- হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস শুনাব, যাহা শুনে তুমি খুশি হবে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ শুনান। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি নিজে সুরা মুলক পড় এবং পরিবারের সবাইকে ও প্রতিবেশীকে উহা শিক্ষা দাও।কারণ উহা মুক্তিদানকারী ও ঝগড়াকারী। কেয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করে উহার পাঠকারীকে সে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবে এবং কবরের আজাব থেকে বাঁচিয়ে

রাখবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার একান্ত কামনা যে, এই সুরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গেঁথে (মুখস্ত) থাকুক।' (ইবনে কাসির)

- হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন মাজিদে ৩০ (ত্রিশ) আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা রয়েছে, যা তার তেলাওয়াতকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে। আর সুরাটি হলো تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ' অর্থাৎ সুরা মুলক।' (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার মন চায় প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে যেন সুরা মুলক মুখস্ত থাকে।' (বাইহাকি)

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তোমরা সুরা মুলক শিখে নাও এবং নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের শেখাও। এটা কবরের আজাব হতে রক্ষা করবে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এই সুরা পাঠকারীর পক্ষে কথা বলে তাকে মুক্ত করবে।'

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত সুরা মুলক তেলাওয়াতের আমল করবে সে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবে।' (তিরমিজি, মুসতাদরাকে হাকেম)

সুরা মুলক তেলাওয়াতের সময়সুরা মুলক রাতের বেলা পড়া উত্তম, তবে অন্য যেকোনো সময়ও পড়া যাবে। সুরাটি অর্থ বুঝে নিয়মিত পড়ায় রয়েছে অনন্য তাৎপর্য। এই সুরা নামাজের সঙ্গে পড়াও উত্তম। মুখস্ত না থাকলে দেখে দেখে অর্থ বুঝে পড়লে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসে এসেছে-- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা মুলক তেলাওয়াত না করে রাতে ঘুমাতে যেতেন না।' (তিরমিজি)

- হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিফ লাম মীম তানযিল ও তাবারাকাল্লাজি না পড়ে কখনো ঘুমাতে যেতেন না।'

সুরা মূলক ৪১ বার (একচল্লিশ) তেলাওয়াত করলে সব বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ঋণ পরিশোধ হয়। এ সুরা পাঠে কবরের আজাব থেকেও বাঁচা যায়।

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা মুলক না পড়ে ঘুমাতে যেতেন না মর্মে বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই আলেম-ওলামা ও বুজুর্গানে দ্বীনগণ ইশার নামাজের পর সুরা মুলকের তেলাওয়াতের আমল করার কথা বলেন। সুতরাং রাতে ঘুমানোর আগে কিংবা ইশার নামাজের পরে বুঝে বুঝে সুরা মুলক পড়া যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সুরা মুলকের আমল নিয়মিত করার তাওফিক দান করুন। হাদিসে ঘোষিত ফজিলত লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উপসংহার:

অতএব, কুরআন শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও নেহায়েত জরূরী এবং তাতে অশেষ সওয়াব আছে। প্রতি গ্রামে মুসলমান ভাইগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করবেন, যাতে গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপিত হয়। সেই মক্তবে ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। বয়স্কদেরও কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য কিছু সময় বের করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য সময় মিলে, আর আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য সময় মিলবে না?

শিক্ষক যদি বিনা বেতনে পাওয়া যায়, তবে ভালই। নতুবা সকলে মিলে চাঁদা করে শিক্ষকের জীবিকা নির্বাহের যোগ্য কিছু সম্বল সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। যে সমস্ত ছেলেরা দারিদ্রতার কারণে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়তে পারে না, তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যক। এই প্রথা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দেশে এখনও প্রচলিত আছে, যেমন- দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভবন এবং অন্যান্য মাদরাসায় ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। আর ছেলেরা মক্তবে যতটুকু শিক্ষা করবে, ততটুকু তারা বাড়ীর মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কুরআন শরীফ শিক্ষা করতে পারে। যদি কেউ আমপাড়া দেখে পড়তে না পারে, তবে অন্ততপক্ষে কিছু সংখ্যক সূরা মুখস্ত পড়ে নেওয়া আবশ্যক।

কুরআনে কারীমের প্রতি ইমামে আ‘জমের আযমত

আবু হানীফা রহ. ইজতিহাদে সবচেয়ে বড় ও বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। এ কারণে তাকে ‘ইমামে আযম’ বলা হয়। তিনি কুরআন শরীফের বড় আশেক ছিলেন। ছিলেন কুরআনী জ্ঞানের মহাপন্ডিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফিক্বের প্রবর্তন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধীকারী ছিলেন। ইলম ও আলেমদের তিনি খুবই সম্মান করতেন। কুরআন শরীফের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক অনুভব করতেন। তাদের প্রতি ছিল তার ঐকান্তিক ভালোবাসা। তাঁদেরকে খুশি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁদের সেবায় থাকতেন উৎসর্গিত।

একদিনের ঘটনা। তাঁর ছেলে যেদিন শিক্ষকের নিকট পবিত্র কুরআনের সবক শুরু করল, সেদিন তিনি ছেলের শিক্ষকের খেদমতে পাঁচ হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর যেদিন তাঁর ছেলে সূরা ফাতিহা শেষ করল, সে দিনও তিনি শিক্ষকের খিদমতে পাঁচ হাজার দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন এবং অতি নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে আরয করলেন, “আল্লাহর কসম, যদি আমার নিকট এর চেয়েও বেশি দেরহাম থাকত, তবে অবশ্যই তাও আপনার খেদমতে পেশ করতাম।”